কাব্য-শ্রী

ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

কাব্য-শ্রী

Kavya-Shree

(on Bengali Rhetoric)

By Dr. Sudhir Kumar Dasgupta

Price Rs 5·00 (Rupees Five only)

কাব্য-শ্রী

কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব লেক্‌চারার
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্‌.এ., পি-এইচ্‌. ডি.
প্রণীত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট, লিঃ
● ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ●

প্রকাশক :
শ্রী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট, লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭১

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীহরলাল বর্দ্ধন
বর্দ্ধন প্রেস
৮/৪এ, কাশী ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করি, ইহা আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা। কাব্যালোকের ভূমিকায় এবং উহার পঞ্চম পরিচ্ছেদে অলঙ্কার-সম্বন্ধে পৃথক্ বিচার করিবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছিল। তখন ইচ্ছা ছিল কাব্যালোকের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উহার আলোচনা সম্পন্ন করিব। কিন্তু ঘটনা-ক্রমে উহা পৃথক্ পুস্তক-রূপে পূর্বেই প্রকাশ করিতে হইল। ইহার একটি বড় কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যে অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনার জন্য ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তাগিদ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া এইরূপ একখানি বই-এর বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন এবং আমাকে একখানি পত্র লেখেন। বইখানি এতদিনে লিখিত ও প্রকাশিত হইল। সর্বাগ্রে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার এই উৎসাহপ্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আলঙ্কারিক বিশ্লেষণ বা বাঙ্গালা সাহিত্যের খাঁটি অলঙ্কারনির্ণয়ের প্রচেষ্টা কখন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। ৮৭ বৎসর পূর্বে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় যে কাব্য-নির্ণয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার অলঙ্কার-প্রকরণ দীর্ঘকাল পঠিত ও পাঠিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা গ্রন্থের গৌরব অপেক্ষা পরবর্তী যুগের পণ্ডিতগণের অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনায় ঔদাসীন্যই প্রকাশ করে বেশি। বিদ্যানিধি মহাশয়েরও পূর্বে পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় সাহিত্যমুক্তাবলী নামে একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেকালকার পরিদর্শক পত্রিকা (১২৬৯ সাল, ১লা পৌষের সংখ্যা) কাব্যনির্ণয় ও সাহিত্য-মুক্তাবলীর ভেদকে 'স্বর্গ ও নরকে যেরূপ ভেদ, সেইরূপ ভেদ' বলিয়া বুঝাইয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের অলঙ্কারদর্পণ-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন অলঙ্কার-গ্রন্থ নহে। বাচস্পতি মহাশয় উপক্রমণিকায় নিজেই বলিয়াছেন,—"সাহিত্য-দর্পণের দশম পরিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়া আমার এই অলঙ্কারদর্পণ লিখিত হইয়াছে, ইহা দশম পরিচ্ছেদের অনুবাদস্বরূপ। তবে স্থানে স্থানে বাঙ্গালা

পুস্তক হইতে উদাহরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।” কৌতূহলবশে আরও একখানি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। গ্রন্থখানি মহাকাব্য, নিবাতকবচবধ, কবি মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি-প্রণীত। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়, উহার চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সর্গে বিবিধ অর্থালঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি-প্রকাশিত বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের অলঙ্কার-চন্দ্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবতরণিকায় তিনি নিবেদন করিয়াছেন যে, সংস্কৃতের অলঙ্কারসূত্রগুলি লালমোহন ও শিতিকণ্ঠের জটিল সংস্কৃতানুগ ভাষা ত্যাগ করিয়া সহজ বাঙ্গালায় বলা এবং আমাদের সাহিত্য হইতে, বিশেষ ভাবে আধুনিক সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বুঝান,—এই দুইটিই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং সেজন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

আমাদের এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য এই দুইটি উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত আরও কিছু। আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি; এবং তদনুযায়ী অলঙ্কারগুলির সংজ্ঞাবিচার, ব্যাখ্যান, পরিভাষা নির্মাণ এবং বিশ্লেষণ ও বিভাগ করিয়াছি, আবশ্যকমত নূতন অলঙ্কারও সন্নিবেশ করা হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর ইংরাজী অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া যেখানে সম্ভবপর হইয়াছে, পূর্ব অলঙ্কারগুলির ব্যাখ্যানসূত্রে তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং মূল অলঙ্কারের অন্তর্গত করিয়া বা পৃথক্ ভাবে নূতন নামকরণ দ্বারা তাহাদের স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পূর্বসূরিগণের প্রতি অন্ধ ভক্তি তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না নিশ্চয়; কারণ, আচার্যগণ[১] অনেকেই নূতন সৃষ্টি করিয়া এবং নূতন সরণি প্রস্তুত করিয়া

১। সংস্কৃতে অলঙ্কারশাস্ত্র প্রায় ব্যাকরণশাস্ত্রের মতই বিশাল। প্রধান আচার্যগণের সংখ্যাও কম নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর আলঙ্কারিক গ্রন্থকারগণের সংখ্যাও শতাধিক। কোন কোন অলঙ্কার-গ্রন্থের টীকার সংখ্যাও পঁচিশের বেশী। উপরের হিসাবে টীকাকারগণকে গণনা করা হয় নাই। ভরত (খ্রীঃ পূঃ ২য় হইতে খ্রীঃ ২য় শতাব্দী), ভামহ (৭ম—৮ম শতাব্দী), দণ্ডী (৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ), উদ্ভট (৯ম শতাব্দী), বামন (৮ম—৯ম শতাব্দী), রুদ্রট (৯ম শতাব্দী), ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধন (৯ম শতাব্দীর মধ্য ভাগ), অভিনবগুপ্ত (১০ম—১১শ শতাব্দী), রাজশেখর (১০ম শতাব্দী), ধনঞ্জয় (১০ম শতাব্দী), কুন্তক (১০ম—১১শ শতাব্দী), ভোজ (১১শ শতাব্দী), মম্মট ভট্ট (১১শ—১২শ শতাব্দী), বিশ্বনাথ (১৪শ শতাব্দী), জগন্নাথ (১৭শ শতাব্দী)—প্রধান আচার্যগণের মধ্যে ইঁহাদের অনেকেই গণনীয়।

স্বতন্ত্রভাবে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই মহিমাই আজও তাঁহাদিগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সে দেবভাষা আজও জীবিত থাকিলে তাঁহাদের যোগ্য বংশধরগণ নিশ্চয়ই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নূতন কথা বলিতেন এবং নূতন আলোকপাত করিতেন। আমাদের শক্তি নাই, কিন্তু সাহস-সহকারে পদক্ষেপ করিয়াছি। ভরসা, নবীনগণ উজ্জ্বল প্রতিভা লইয়া অগ্রসর হইবেন এবং সাফল্য অর্জন করিবেন।

আমাদের অপর উদ্দেশ্য অলঙ্কারশাস্ত্রকে সাহিত্যের আলোচনা, আস্বাদন, শক্তি ও সৌন্দর্যোপলব্ধির এবং সরস সাহিত্য-রচনা শিক্ষার উপায় হিসাবে বিশেষভাবে গ্রহণ করা। সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাকে এক ব্যাবহারিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ব্যাকরণ-পাঠ দ্বারা সাহিত্য-শিক্ষার আরম্ভ, অলঙ্কার-পাঠ দ্বারা সাহিত্য-শিক্ষার সমাপ্তি। কেহ কেহ মনে করেন, ব্যাকরণ হইতেই অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্ভব। ব্যাকরণে বাক্যশুদ্ধি ও রচনাশুদ্ধি শিক্ষা দেয়। অলঙ্কার শিক্ষা দেয় ভাব-শুদ্ধি ও চিন্তা-শুদ্ধি, রচনার শৃঙ্খলা, সরসতা, সবলতা, সার্থকতা বা অমোঘতা। ইহা বুদ্ধিকে পরিষ্কার করে, ধারণাকে সবল করে, অন্তর্দৃষ্টিকে নির্মল করে, কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, আস্বাদনী শক্তি ও সমালোচনা-শক্তিকে প্রখর করে; ইহা উদ্দীপ্ত করে বিশ্বব্যাপিনী সহৃদয়তা ও সহানুভূতি। ইহা অবক্তাকে বক্তা এবং অকবিকে কবি হইতে সাহায্য করে। "কিন্তু কবি যদি অলঙ্কার শিখে, তাহা হইলে অনিন্দনীয় কবি হয়, বক্তা যদি অলঙ্কার শিখে তাহা হইলে সে অনিন্দনীয় বক্তা হইতে পারে।"[১] এখানে অলঙ্কারশাস্ত্র ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইল।

সংস্কৃতে অলঙ্কারশাস্ত্র বিচারে অনেক সময়ে সৌন্দর্য অপেক্ষা চাতুর্য এবং কাব্যাস্বাদন অপেক্ষা ন্যায়ের বিচারকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। আমরা প্রধানতঃ সাহিত্য-আস্বাদন ও বিশ্লেষণের দিক হইতেই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইতি—

বিনীত
গ্রন্থকার

১৫ই আষাঢ়, ১৩৫৬,
কলিকাতা।

১। বঙ্গদর্শন, ৮ম খণ্ড, বৈশাখ ১২৮৮, ১ম সংখ্যা, 'অলঙ্কারশাস্ত্র' প্রবন্ধ।

নিবেদন

অলঙ্কার আলোচনা বিষয়ে অধ্যাপক ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের অধিকার সর্বজনবিদিত। এ-বিষয়ে পণ্ডিত মহলে যেমন তাঁহার খ্যাতি ছিল, সাহিত্য-রসিক সমাজেও স্বীকৃতি ছিল, ছাত্র-সমাজেও তাঁহার সর্বজনপ্রিয়তা ছিল। এ-বিষয়ে অধ্যাপক দাশগুপ্তের বিশেষাধিকারের যথেষ্ট কারণ ছিল। বাঙলা অলঙ্কার-শাস্ত্র মুখ্যতঃ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত অলঙ্কার ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে একদিকে যেমন সাহিত্যরসবোধের প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনই নৈয়ায়িক চিন্তা-কুশলতারও অপেক্ষা আছে। অধ্যাপক দাশগুপ্তের এই দুইটি জিনিসই পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। ইহার সহিত তাঁহার ছিল প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের সকল রূপের সহিত নিবিড় পরিচয়। এ-বিষয়ে আরও একটি সত্য লক্ষ্য করিতে হইবে। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ইংরেজী বচন-রীতি ও অলঙ্কারও বাঙলা ভাষার উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত এই সত্যটি সম্বন্ধেও বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। এই সকল জিনিস একত্র হইয়াই অধ্যাপক দাশগুপ্তকে বাঙলা-অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনার একটি বিশেষ অধিকার দান করিয়াছিল। তাঁহার আকস্মিক পরলোকগমন এ-ক্ষেত্রে তাই সত্যই একটি অপূরণীয় অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে।

'কাব্য-শ্রী' প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক দাশগুপ্ত সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই গ্রন্থখানিকে তিনি দুইখানি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিবেন; একখানি বড় গ্রন্থে এ-বিষয়ে আরও সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করিবেন এবং বাঙলা-সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া আলোচনাকে সুসম্পূর্ণ করিবেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে সকল আলোচনা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া সহজভাবে সব বিষয়টি যাহাতে ছাত্রগণের বোধগম্য হয় সেইভাবে একটি আপেক্ষিক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিবেন। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে তিনি তাঁহার সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। শুধু

সংক্ষিপ্ত সংস্করণে হাত দিয়াছিলেন, তাহাও সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণটি সেই আপেক্ষিক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। অবশ্য মূল বক্তব্যকে এখানে কিছুই সংক্ষিপ্ত করা হয় নাই; কিছু কিছু ব্যাখ্যা বা সূক্ষ্ম বিচার বাদ দেওয়া হইয়াছে, কিছু কিছু উদাহরণও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ঈষৎ সংক্ষিপ্ততায় গ্রন্থ বুঝিতে কোনই অসুবিধা হইবে না,—বরঞ্চ আলোচনাকে আরও সংহত ও সহজগ্রাহ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহাতে সব জিনিসটিকে গ্রহণ করিতে ছাত্রসমাজের পক্ষে আরও সুবিধা হয়।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণটি অসম্পূর্ণ রাখিয়া পরলোক-গমন করেন। অসম্পূর্ণ অংশটি দেখিয়া দিবার ভার আমার উপর পড়ে। এ-বিষয়ে আমি অধ্যাপক দাশগুপ্তের ন্যায় অধিকারী নহি; তথাপি তাঁহার পূর্বসঙ্কল্প এবং নব সংস্করণের পরিকল্পনা আমার সব জানা ছিল বলিয়া তাঁহার পরিকল্পনা মতই বাকি অংশের রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে ছাত্র-সমাজকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া তিনি বর্তমান সংস্করণটিকে একটি সুপরিকল্পিত রূপদান করিয়াছেন গ্রন্থখানি সেই ছাত্র-সমাজের সাহিত্যানুশীলনের কাজে যথোপযুক্ত সহায়তা করিলেই তাঁহার স্বর্গত আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে। অধ্যাপক দাশগুপ্তের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল শ্রীযুত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থখানিকে নির্ভুল এবং শোভনরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি করেন নাই। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১লা আষাঢ়, ১৩৬৩

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

গূঢ়ার্থ-মূল অলঙ্কার

বিবিধ

প্রথম অধ্যায়

অলঙ্কার—স্বরূপ-বিচার

প্রাচীন আলঙ্কারিক বামন বলিয়াছেন,—"সৌন্দর্যই অলঙ্কার।"[১] অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ তাই সৌন্দর্য-শাস্ত্র বা কাব্যসৌন্দর্য-বিজ্ঞান; ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে Æsthetic of Poetry।

অলঙ্কার হইতেছে কাব্য-শ্রী—"the beautiful in Poetry"। উহা কাব্য-তরুর কুসুম, শব্দার্থ-রূপ শাখায় শাখায় প্রস্ফুটিত হইয়া সার-ভূত বস্তুরূপেই কাব্য-তরুর শোভা সম্পাদন করে, কখনও বা রসময় পরম ফল দান করে। কাব্যের সজ্জা ও সার-ভূত বস্তু বলিয়াই উহা কাব্যের সৌন্দর্য।

যাহাতে যাহার স্বরূপ-প্রকাশ বা আত্ম-ধর্মের পরিপুষ্টি, তাহাই তাহার জীবন এবং তাহাই তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য বা অলঙ্কার। অস্ত্ররাশি ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার। বিদ্যা ও তপস্যা ব্রাহ্মণের অলঙ্কার। গৃহিণী গৃহের অলঙ্কার।

আত্ম-ভূত বা অঙ্গ-ভূত সৌন্দর্যই প্রকৃত অলঙ্কার।

সংস্কৃতে অলম্ শব্দের এক অর্থ 'ভূষণ'; অতএব অলম্ বা ভূষণ করা হয় যাহা-দ্বারা, তাহাই অলঙ্কার। অলঙ্কার শব্দের ব্যাপক অর্থ তাই সৌন্দর্য অর্থাৎ কাব্যসৌন্দর্য, যথা—রস, ধ্বনি, গুণ, রীতি, অথবা অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি। সঙ্কীর্ণ বা বিশিষ্ট অর্থ—কেবল অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য।

সংস্কৃতে অলম্ শব্দের অন্য প্রসিদ্ধ অর্থ হইতেছে 'পর্যাপ্তি'—প্রাচুর্য বা পরিপূর্ণতা। অলম্ অর্থাৎ বস্তুর পর্যাপ্তি বা পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হয় যাহা দ্বারা (অলম্-কৃ + ঘঞ্—করণবাচ্যে), তাহাই অলঙ্কার।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণীয়—"অলঙ্কার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। 'অলম্'—অর্থাৎ 'বাস্, আর কাজ নেই।' এই অলঙ্কৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।" —সাহিত্যধর্ম (সাহিত্যের পথে)

প্রাচীন অলঙ্কারাচার্যগণের মধ্যে বামনই সর্বপ্রথমে স্পষ্ট করিয়া কাব্যালঙ্কারকে কাব্য-সৌন্দর্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার মতে রীতি,

---

১। "সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ"—কাব্যালঙ্কার, ১।১।২

গুণ প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ; তাহাদের উৎকর্ষ ঘটায় অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার। অবশ্য তৎপূর্বে দণ্ডী অলঙ্কারকে 'কাব্যশোভাকর ধর্ম'[১] বলিয়া প্রায় একই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই অলঙ্কারাচার্যগণের, বিশেষতঃ তাঁহাদের টীকাকারগণের ব্যাখ্যান পাঠ করিলে মনে হয়, প্রাচীনগণ অনুপ্রাস বা উপমাদি অলঙ্কারকে ঠিক কাব্যের অবিচ্ছেদ্য নিত্য ধর্ম বলিয়া গণ্য করিতেন না, বলয়কুণ্ডলাদি বাহ্যালঙ্কারের সাদৃশ্যে তাঁহারা উহাদিগকে কাব্যশোভা-বর্ধক আরোপ্যমাণ অলঙ্কার বলিয়াই মনে করিতেন।

এই বিষয়ে ধ্বনিবাদিগণের গুরু অজ্ঞাতনামা কাব্য-রসিক তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে অলঙ্কারের একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"রস কর্তৃক আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হইলে যাহার রচনা সম্ভবপর হয়, রসের সহিত একই প্রযত্নে যাহা সম্পন্ন বা সিদ্ধ হয়, ধ্বনিশাস্ত্রে তাহাই অলঙ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।"

ধ্বনিকারের অলঙ্কার-সংজ্ঞায় দুইটি লক্ষণের প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে,—রসাক্ষিপ্ততা অর্থাৎ রসকর্তৃক আকৃষ্ট হওয়া, এবং অপৃথগ্-যত্ন-সম্পাদ্যতা অর্থাৎ একই প্রযত্নে সিদ্ধ হওয়া। রস নিজেকে মূর্ত করিতে যাইয়া রূপসৃষ্টির পথে অলঙ্কারকে আকর্ষণ করে, এবং অলঙ্কার যেন রসের রূপে পরিণতির পথে স্বয়ং স্ফূর্ত হয়। অতএব রস ও অলঙ্কার মহাকবির এক প্রযত্ন দ্বারাই সিদ্ধ হয়। উভয় লক্ষণ ফলতঃ এক হইলেও দ্বিতীয়টি উল্লেখ করার আবশ্যকতা আছে। অলঙ্কার যে কাব্য-রচনার পর কবির ভিন্ন প্রযত্ন দ্বারা কাব্য-দেহে আরোপিত হয় না, অতএব বলয়কুণ্ডলের ন্যায় উহা বহির্ভূষণ মাত্র নহে, ইহা স্পষ্টই ইঙ্গিত করা হইল। বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠকাব্যে বাচ্য ও অলঙ্কার পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না। বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন তাই বলেন,—"রসাভিব্যক্তি ব্যাপারে অলঙ্কারসমূহ কাব্যের বহিরঙ্গ হয় না।"[২] চিত্রাঙ্গদা কাব্যের আস্বাদন করিতে যাইয়া প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন,—"আসল কথা এই যে অলঙ্কার হচ্ছে কাব্যের একরূপ ভাষা।"[৩]

১। "রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্য-ক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ন-নির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ॥ —ধ্বন্যালোক, ২।১৭

২। "ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ।"— ধ্বন্যালোক, ২।১৭ বৃত্তি

৩। চিত্রাঙ্গদা ('কবি-পরিচিতি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ হইতে দুইটি ছোট বাক্য লইয়া উদাহরণ দেখান হইতেছে। 'বর্ষশেষ' কবিতায় ঝড়কে আহ্বান করা হইতেছে,—

"ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য হোক্ তবে।"

দীর্ঘ ছন্দ এবং অনুপ্রাস অলঙ্কারের কুশল প্রয়োগে সঙ্গীত-ধর্মের মধ্য দিয়া কালবৈশাখীর শব্দময় রূপ ফোটান হইয়াছে ; কাব্যার্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে রসানুকূল বর্ণ-বিন্যাসের মধ্য দিয়া। এখানে এই চরণের যাহা কাব্য-সৌন্দর্য, তাহা অনুপ্রাস-অলঙ্কারাশ্রিত ধ্বনি-বিন্যাসের উপরই প্রথমে নির্ভর করে। ইহা শব্দালঙ্কার। পরে জাগে চিত্রধর্মে একটি চমৎকার অর্থালঙ্কার— কালবৈশাখীর উন্মাদনা-পূর্ণ ভয়ঙ্কর নটীরূপ। এই দুইটি অলঙ্কারই এখানে কাব্যের ভাষা, কাব্যের আসল বাচ্য। উহা বাদ দিলে রচনার কাব্যত্ব আর থাকিবে না, বাক্যটি বুঝাইবে একটি তথ্য মাত্র,—"তাহা হইলে কালবৈশাখীর ঝড় আসুক।" অর্থালঙ্কারটি বজায় রাখিয়া, এমন কি একটি নূতন অনুপ্রাস অলঙ্কার দিয়াও যদি কবির ব্যবহৃত শব্দালঙ্কারটি পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলেও উহা হইবে একান্ত শক্তিহীন। যদি লেখা হয়,—

ঝড়ের নূপুর পরি, নাচ তবে মন হরি
পাগলিনী হে কালবৈশাখী !

ইহার ধ্বনি-সম্পদ কিছুই নয়। ভাব এখানে শব্দ-সঙ্গীতে রূপ লাভ করে নাই।

'দুঃসময়' কবিতার শেষের একটি চরণ লওয়া হইতেছে,—

"আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন"

এখানে বিহঙ্গের রূপকটিবাদ দিলে 'পাখা' এবং 'নভ-অঙ্গন' দুইই চলিয়া যাইবে। কিন্তু কাব্য থাকিবে কি ? যাহা লিখিত হইবে, তাহাতে থাকিবে জীবনের গতি ও জীবনের কর্মভূমির কথা, সে কথা তো গদ্য, হিতোপদেশের তথ্য। রূপক অলঙ্কারই এখানে কাব্যের সমগ্র রূপ এবং অর্থের ব্যঞ্জনাময় সৌন্দর্যটি ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

ধ্বনিকারের এই অভিমতের যেন স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় আধুনিক যুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মুখে। অলঙ্কার সম্পর্কে ক্রোচে বলিতেছেন—

"নিজেকেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে অলঙ্কার কি ভাবে বাচ্যার্থের সহিত যুক্ত হয়। বহিরঙ্গভাবে? সে ক্ষেত্রে ইহা অবশ্যই সর্বদা পৃথক্ থাকে। অন্তরঙ্গভাবে? সে ক্ষেত্রে হয় ইহা বাচ্যার্থের সাহায্য করে না, উহাকে নষ্ট করে; নয় উহার অঙ্গীভূত হয় এবং অলঙ্কাররূপে থাকে না, ইহা হয় সমগ্র হইতে নির্বিশেষ বাচ্যার্থের এক মৌলিক উপাদান।"[১]

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ক্রোচে ornament বা অলঙ্কার শব্দটি বহিরঙ্গভূষণ,—এই প্রচলিত অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

ওয়াল্টার পেটারও স্বল্পাক্ষরে সংহতভাবে ঐ একই উক্তি করিয়াছেন,—
"...গ্রহণযোগ্য অলঙ্কার প্রধানতঃ কাব্যাঙ্গ-ভূত বা প্রয়োজনভূত।"[২]

অধ্যাপক জিনাং কথাটি আরও সহজ করিয়া বলিয়াছেন,—

"অলঙ্কারের উপযোগিতার একটি ভাল পরীক্ষা হইল ইহার স্বাভাবিকতা। বিষয় হইতে ইহা স্বতঃই স্ফূর্ত হইবে, ইহাই যেন বাচ্যার্থের একমাত্র প্রয়োজনীয় রূপ।"[৩]

'সাহিত্যদর্পণ'-কার নিজ উক্তির সমর্থনে একটি বচন উদ্ধার করিয়াছেন--
"শব্দার্থযুগল কাব্যের শরীর, রসাদি আত্মা, গুণসমূহ শৌর্যাদির ন্যায়, দোষসমূহ কাণত্বাদির ন্যায়, রীতিসমূহ বিশিষ্ট অবয়ব-সংস্থানের ন্যায় এবং অলঙ্কারসমূহ বলয়-কুণ্ডলাদির ন্যায়।"[৪]

১। "One can ask oneself how an ornament can be joined to expression. Externally? In that case, it must always remain separate Internally? In that case, either it does not assist expression and mars it; or it does form part of it and is not ornament, but a constituent element of expression, indistinguishable from the whole."

—*Æsthetic*, Ch. IX. p. 113.

২। ......permissible ornament being for the most part structural or necessary."

—*Appreciations*: *Style*.

৩। "A good test of a figure's usefulness is its naturalness; it ought to rise spontaneously out of the subject if it were the one necessary form of expression."

—*The Practical Elements of Rhetoric* by John F. Genung, Ph.D.

৪। "কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্ রসাদিশ্চাত্মা. গুণাঃ শৌর্যাদয় ইব, দোষা কাণত্বাদিবৎ, রীতয়ঃ অবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাশ্চ কটককুণ্ডলাদিবৎ।" —সাহিত্যদর্পণ, ১।২.বৃত্তি

এই উক্তি, কোন্ সময়ের কাহার রচনা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু বাচন-ভঙ্গীটির জন্য ইহা সুপ্রচলিত হইয়াছে। ফলে কেহ কেহ অলঙ্কারসমূহকে নাম-সাদৃশ্যে বলয়-কুণ্ডলাদির ন্যায় কাব্য-শরীরের বহিরাভরণ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। আশ্চর্য! ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন তিন চারি শতাব্দী পূর্বে ঐরূপ যুক্তিপূর্ণ চমৎকার ব্যাখ্যান দেওয়া সত্ত্বেও তাহা পরবর্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

যাহা হউক্, বিশ্বনাথের অলঙ্কার-সংজ্ঞাটিতে মূল বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে—

"রসাদির পুষ্টি করিয়া সেই অলঙ্কারসমূহ অঙ্গদাদি ভূষণের ন্যায় কার্য করিয়া থাকে।"[১]

যাহা রসাদির পুষ্টি করে, তাহা কেবল বাহিরের প্রসাধন হইতে পারে না। অলঙ্কার থাকিলে তাহা রসাদির পুষ্টি করিয়াই থাকে, এবং সেই সেই ক্ষেত্রে অলঙ্কারগুলির অভাব হইলে রসাদির পুষ্টিরও অভাব হয়। অলঙ্কার নাই, এরূপ কাব্য আছে এবং হইতেও পারে। কিন্তু অলঙ্কার যেখানে আছে, সেখানে তাহা কাব্যের সৌন্দর্যজনক এবং কাব্যের শরীর শব্দার্থেরই অভিন্ন রূপ মাত্র। সে রূপ বাদ দিয়া রসের প্রকাশ হয় না। অতএব উত্তম কাব্যে অলঙ্কার হইতেছে কাব্যের ভাষা ও বাচ্য, কাব্যের আসল রূপ। ভাবের 'রূপের মাঝারে অঙ্গ' লাভই প্রকৃত অলঙ্কার।

বলয়কুণ্ডলের উপমা তাই সীমাবদ্ধ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। অভিনব গুপ্ত ধ্বন্যালোকের 'লোচন' টীকায় প্রসঙ্গ-ক্রমে কটককেয়ূরাদির অলঙ্কারত্ব সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, তাহা সুধীচিত্তে আনন্দ দেয়। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—"কটককেয়ূরাদি শরীরে সংযুক্ত হইলেও সেই সেই চিত্তবৃত্তি-বিশেষের ঔচিত্য-সূচক বলিয়া চেতন আত্মাই অলঙ্কৃত হয়। সেই জন্যই অচেতন শবশরীর কুণ্ডলাদির যোগেও শোভা পায় না। কারণ, সেখানে অলঙ্কৃত হইবেন যিনি, তিনিই যে নাই! আবার সন্ন্যাসীর শরীর বলয়াদি-অলঙ্কারযুক্ত হইলে হাস্য উদ্রেক করে। কারণ, সেখানে যাহাকে অলঙ্কৃত

১। "রসাদীন্ উপকুর্বন্তোঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ।" —সাহিত্যদর্পণ, ১০।১১

করিবে, তাহার সম্বন্ধে উহার ঔচিত্য নাই। দেহের তো অনৌচিত্য বলিয়া কিছু নাই। অতএব বস্তুতঃ আত্মাই অলঙ্কৃত হয়,—আত্মাই অলঙ্কার্য।"[১]

চেতন আত্মাই অলঙ্কার্য—ইহাই অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল কথা। অলঙ্কার এই আত্মার স্বরূপ-ভূত বা অঙ্গ-ভূত সৌন্দর্য।

১। "কটককেয়ূরাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষৌচিত্য সূচনাত্মতয়া অলঙ্ক্রিয়তে। তথাহি অচেতনং শবশরীরং কুণ্ডলাদ্যুপেতমপি ন ভাতি। অলঙ্কার্যস্য অভাবাৎ। যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্যাবহং ভবতি। অলঙ্কার্যস্য অনৌচিত্যাৎ। ন চ দেহস্য কিঞ্চিৎ অনৌচিত্য ইতি বস্তুত আত্মা এব অলঙ্কার্যঃ।"

—ধ্বন্যালোক, ২।৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

অলঙ্কার—রূপ-বিচার

সৌন্দর্যের সাধারন লক্ষণ হইতেছে চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করা। রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে অতি সহজ ভাষায় বলিয়াছেন,—"যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।...নিবিড় বোধের দ্বারা প্রমাণ হয় সুন্দরের।"[১] অনেক গবেষণার পর পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দরও ঐ একই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"যেখানে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দর।"[২]

প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট করিয়া প্রায় একই উক্তি করিয়াছেন। জগন্নাথ কাব্যের সৌন্দর্য বা রমণীয়তার সংজ্ঞা করিয়াছেন,—"অলৌকিক আনন্দের জ্ঞানগোচরতা।"[৩] সাহিত্যের আনন্দ বা কাব্যানন্দ অলৌকিক আনন্দ।

শুষ্ক কাষ্ঠে আগুন লাগিলে যেমন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি যখন কথা শোনামাত্র মনে জাগে অর্থের দীপ্তি—যেন তাহা কানের ভিতর দিয়া মর্মে গিয়া প্রবেশ করে, তখন মন হয় চমৎকৃত, অর্থোপলব্ধির সঙ্গেই মনে জাগে আনন্দ, মন বলে সুন্দর! ইহাই এক কাব্যসৌন্দর্য। এইরূপে উক্ত গুণগুলি আরও পরিস্ফুট হয় যদি বাক্যের ধ্বনিই অর্থকে প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে এবং বাক্যের অর্থ তত্ত্ব ও তথ্যকে রূপে উল্লসিত করে। সাধর্ম্যের সূত্রে বিধৃত হইয়া যদি রূপের জগৎ—জগতের চিত্রশালা খুলিয়া যায়, মন তৃপ্ত হইয়া বলে সুন্দর! এখানে আরও নব নব কাব্য-সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই প্রত্যেকটি আনন্দ-অনুভূতির পশ্চাতে থাকে এক একটি নিবিড় সৌন্দর্যবোধ। প্রত্যেকটি সৌন্দর্যবোধের মূলে থাকে কাব্যের এক একটি

১। সাহিত্যের পথে। ২। সৌন্দর্যতত্ত্ব (জিজ্ঞাসা)

৩। "রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদ-জ্ঞানগোচরতা।" —রসগঙ্গাধর, পৃঃ ২

বিশিষ্ট বিলাস বা রূপায়ণ। প্রত্যেকটি বিলাস বা রূপায়ণই কাব্যের এক একটি বিশিষ্ট গঠন বা বাচন-ভঙ্গী—এক একটি বিশিষ্ট কাব্যালঙ্কার। নাম না হইলে আমাদের সৌন্দর্য-সম্ভোগ পূর্ণ হয় না। রূপের সহিত নাম চাই। তাই এই খণ্ড খণ্ড বিশিষ্ট কাব্য-গঠন বা কাব্যসৌন্দর্যগুলি ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, কাব্যস্মৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়।

আমাদের কিন্তু মনে রাখা দরকার—অনেকগুলি অলঙ্কার মানবভাষার এক সহজ রূপ, ইহা দেব-দুর্লভ কোন বস্তু নয়। বেদ হইতে বেদিয়া—অসাধারণ ও অতি সাধারণ সকলের মুখেই অলঙ্কার ফুটে; অন্তঃপুরিকাদের অঙ্গের ন্যায় ভাষায়ও কত অলঙ্কারের ছটা! গালি দিতে হইলেও অলঙ্কার! আস্ত গাধা! শয়তান!—যাহাই বলি, পণ্ডিতগণের কাছে তাহা রূপকাতিশয়োক্তি। ভালবাসিতে হইলে অলঙ্কার তো দিতেই হইবে—প্রিয়জন তো নয়, হৃদয়ের ধন, সর্বস্ব! সাগরছেঁচা মাণিক! সেই রূপক বা রূপকাতিশয়োক্তি!—

শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।

সাধারণ কথাবার্তায়ও কত অলঙ্কারের ছড়াছড়ি! 'আপন চরকায় তেল দাও', 'দু নৌকায় পা দিও না', 'কথায় চিঁড়া ভিজে না', 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা', 'মশা মারতে কামান দাগা', 'ডুমুরের ফুল', 'মিছরির ছুরি', 'শাঁখের করাত', 'সোনায় সোহাগা', 'হাতী পোষা'—চলতি ভাষায়ও এইরূপ শত শত পদ রহিয়াছে পণ্ডিতদের কাছে যাহাদের অলঙ্কারের দীপ্তি অম্লান। এই সকল প্রচলিত কথায় বর্ণনার এক মাহাত্ম্য রূপায়ণে, আর এক মাহাত্ম্য মিতভাষণে। ইহাতে বিনা প্রয়াসে বা স্বল্পপ্রয়াসেই অর্থের সাক্ষাৎকার ঘটে।

আধুনিক সাহিত্যে অলঙ্কারের যে নবীনতা ও সরসতা আমাদের চিত্তে হর্ষের চমক দেয়, তাহার পশ্চাতে মুখ্যতঃ নবীন অলঙ্কারের সৃষ্টি বেশি নাই, রহিয়াছে উপমানরূপে নব নব বস্তুর আহরণ এবং নব নব ব্যঞ্জনার সমাবেশ। পুরাকালাগত একঘেয়ে উপমা ও একঘেয়ে প্রকাশভঙ্গীগুলি পরিত্যক্ত হইতেছে।

নূতন চোখে প্রকৃতিকে দেখিয়া নূতন মন লইয়া জগৎকে আস্বাদন করিবার

একটা চেষ্টা জাগিয়াছে। রচনায়ও নব নব ব্যঞ্জনার দীপ্তি দেখা যাইতেছে। অলঙ্কার তাই অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রানুযায়ী পুরান হইলেও আস্বাদনটি নূতন। বাঙ্গালায় এই নূতনত্বের আবির্ভাবকে প্রধানতঃ উদাহরণমালার মধ্য দিয়াই উপলব্ধি করিতে হইবে।

আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রয়োজন বুঝিয়া অলঙ্কারের শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার এই দুই মূল ভেদ স্বীকার করিয়া অর্থালঙ্কারকে মোট ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; যথা—**সম্বন্ধ-মূল, সাদৃশ্য-মূল, বিরোধ-মূল, শৃঙ্খলা-মূল, ন্যায়-মূল,** এবং **গূঢ়ার্থ-মূল**। এই সকল ভেদের লক্ষণ ও বিশদ আলোচনা পরবর্তী দুই অধ্যায়ে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। এখানেও অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

শব্দের দুইটি অংশ—ধ্বনি (Sound) ও অর্থ (Sense)। ধ্বনি হইতেছে সঙ্কেত, অর্থ হইতেছে সঙ্কেতিত। শব্দের সঙ্কেতরূপ যে ধ্বনি, তাহার আশ্রয়ে শব্দালঙ্কার; শব্দের সঙ্কেতিতরূপ যে অর্থ, তাহার আশ্রয়ে অর্থালঙ্কার। শব্দ যেখানে কেবল ধ্বনিরূপ বা Sound value দ্বারা অর্থকে ধ্বনিত বা আভাসিত করিতে পারে, সেখানেই খাঁটি শব্দালঙ্কার। ইহাতেই কাব্যের সঙ্গীত-ধর্ম পরিস্ফুট। বাঙ্গালায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাস অলঙ্কার দ্বারা। অনেক সময়ে প্রচলিত অনুকারাত্মক শব্দগুলি কুশলভাবে প্রযুক্ত হইয়াও একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। অনুপ্রাসে বিভিন্ন শব্দের বর্ণ-সাম্যের ফলে ধ্বনিসাম্য এবং ধ্বনিসাম্যদ্বারা অর্থ আভাসিত হয়। শব্দালঙ্কারের আর একটি ভেদ আছে, তাহা ধ্বনিচাতুর্যমাত্র, তাহা কদাচ অর্থের ইঙ্গিত করে না। যমক, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কার উহার অন্তর্গত।

অর্থালঙ্কারের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ উপমা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি সাদৃশ্য-মূল অলঙ্কার। ইহাতে কাব্যের চিত্রধর্ম পরিস্ফুট। ইহার আশ্রয়ে ব্যঞ্জনার নানা সূক্ষ্ম বিলাসও আস্বাদন করা যায়। বস্তুতঃ অনুপ্রাস ও উপমা এই দুইটিই শ্রেষ্ঠ কাব্যালঙ্কার। অনুপ্রাস যেমন বর্ণসাম্য বা ধ্বনিসাম্য, উপমা সেই প্রকার রূপসাম্য বা অর্থ-সাম্য। একের কারবার শব্দ-জগৎ ও সঙ্গীত লইয়া, অপরের কারবার দৃশ্য-জগৎ ও চিত্র লইয়া। দণ্ডীর[১] অনুসরণে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী যথার্থ মন্তব্য

১। কাব্যাদর্শ—১।৫২ ও ২।১৪

করিয়াছেন,—"এক অলঙ্কারের প্রসাদে কানের কাছে শব্দসমূহ সমান অনুভূত হয়, অপর অলঙ্কারের প্রসাদে মনের কাছে বস্তু সদৃশ প্রতীয়মান হইতে থাকে।" পরেই আবার মন্তব্য করিয়াছেন,—"এ বিশ্বে আমাদের আপাত-দৃষ্টিতে যা বিভিন্ন, তার সমীকরণ করাই হচ্ছে কাব্যের ধর্ম, অর্থাৎ যা কিছু পরস্পর বিচ্ছিন্ন তাদের নিরবচ্ছিন্ন রূপ দিতে আর প্রাক্ষিপ্ত জগৎকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে শুধু কবিপ্রতিভা।"[১]

এইবার আমাদের কৃত অর্থালঙ্কারগুলির মূলভাগ দেখান হইতেছে।

(১) সম্বন্ধ-মূল অলঙ্কার

অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার প্রয়োগে শব্দার্থ ও বাক্যার্থের সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রতীতি না হইলে উপমাদি অলঙ্কারেরও সম্যক্ আস্বাদন সম্ভবপর নয়। এই জন্য সর্বাগ্রে সম্বন্ধ-মূল অলঙ্কার গণনা করা হইল। ইহার দুইটি ভাগ,—লক্ষণা-মূলক ও ব্যঞ্জনা-মূলক। লক্ষণা-মূলকের মধ্যে রহিয়াছে লক্ষ্যোক্তি (Metonymy, Synecdoche প্রভৃতি) এবং আরোপোক্তি বা উপচারিত বিশেষণ (Transferred Epithet)। ব্যঞ্জনা-মূলক হইতেছে পর্যায়োক্তি বা ব্যঙ্গ্যোক্তি অলঙ্কার। সংস্কৃতে লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা উভয়ই শক্তি, মুখ্যতঃ বাক্যেরই শক্তি, বাক্যের আশ্রয়ে শব্দবিশেষে প্রকাশ পায়। ব্যঞ্জনা-শক্তির আশ্রয়ে নির্মিত পর্যায়োক্তি অলঙ্কার যখন দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত, তখন লক্ষণাশক্তির আশ্রয়ে নির্মিত লক্ষ্যোক্তি ও উপচারিত বিশেষণকে অলঙ্কার রূপে গ্রহণ করিতে কোন বাধা হইতে পারে না। ইংরাজীর ন্যায় বাঙ্গালায় এই দুইটিকে পৃথক্ অলঙ্কার রূপে স্বীকার করিলে সাহিত্য আলোচনা ও আস্বাদনের সুবিধা হয়।

(২) সাদৃশ্য-মূল অলঙ্কার

পূর্বেই ইহার ধর্ম আলোচিত হইয়াছে। ইহাই শ্রেষ্ঠ কাব্যালঙ্কার। আরোপ-মূলক, অধ্যবসায়-মূলক, ভেদমূলক—ইহার নানা ভেদ করা যায়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, ভ্রান্তিমান্, সমাসোক্তি, সন্দেহ, নিশ্চয়, নিদর্শনা, অপহ্নুতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

১। 'চিত্রাঙ্গদা' (কবি-পরিচিতি)

অলঙ্কার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই অলঙ্কারের প্রয়োগে কাব্যে বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে, চিত্র-ধর্ম প্রকাশ পায় এবং ব্যঞ্জনার সূক্ষ্ম লীলা গোচর হয়। যাহাদের বাসনালোক যত সমৃদ্ধ, এই অলঙ্কারের উল্লাস তাহাদের রচনায় তত বেশি। মানুষের চিত্তের ধর্মই এই যে, কোনও বিশিষ্ট বস্তু, ভাব বা সৌন্দর্যদ্বারা অভিভূত হইলে, স্মৃতি ও সংস্কারের স্তর ভেদ করিয়া বাসনালোকে জাগে আলোড়ন এবং সমান অনুভূতির সূত্রে বিধৃত কিন্তু বিস্মৃত-প্রায় ভাব, অর্থ, বস্তু বা ঘটনাসমূহ স্পন্দিত হইয়া যেন জীবিত, জাগ্রত হইয়া উঠে, এবং তখনই ঠেলাঠেলি করিয়া বিচিত্র রূপরাশি—কাব্যের উপমানসমূহ—বাহির হইতে থাকে। ইহাই উপমাদি অলঙ্কারের সৃষ্টি-রহস্য। মুখের সৌন্দর্যদ্বারা মুগ্ধ হইলে অপূর্ব সুষমাময় তারা, চাঁদ বা পদ্মফুল আপনি মনে ভাসে। এইগুলির প্রত্যেকটিই বাসনা-খনির এক-এক খানি সোনা।

(৩) বিরোধ-মূল অলঙ্কার

এইগুলির সৌন্দর্য সাদৃশ্যে নয়, নানা প্রকার কল্পিত বিরোধে। বিরোধ যেখানে প্রকৃত নহে, প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ, দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বাচন-ভঙ্গীতেই তাহার প্রাণ, সেখানে তাহা এক বিশিষ্ট সৌন্দর্য ; বর্ণনীয় বিষয়টিকে তাহা বিদ্যুদ্-দীপ্তিতে চিত্তে গাঁথিয়া লয়। বিভাবনা, বিশেষোক্তি, বিষম, বিরোধাভাস, অসঙ্গতি প্রভৃতি অলঙ্কার এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৪) শৃঙ্খলা-মূল অলঙ্কার

যেখানে সৌন্দর্য পদ বা বাক্যাংশগুলির সন্নিবেশ-শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে, সেখানে এই অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব যাহাই হউক, সংখ্যা কম। কারণমালা, একাবলী, মালাদীপক, সার প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৫) ন্যায়-মূল অলঙ্কার

এখানে সৌন্দর্য নির্ভর করে বাক্যের ন্যায়-সঙ্গত সমর্থন, অথবা কার্য-কারণ সম্পর্কে প্রৌঢ়োক্তি-পুষ্ট সমর্থনের উপর। অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান প্রভৃতি অলঙ্কার ইহার অন্তর্গত।

(৬) গূঢ়ার্থ-মূল অলঙ্কার

প্রাচীনদের সম্মত পূর্ণ নামটি হইতেছে গূঢ়ার্থপ্রতীতি-মূল অলঙ্কার। 'প্রতীতি' শব্দটি এখানে অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যক নয়। এই অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব অনস্বীকার্য। যেখানে প্রস্তাবিত বাক্যের অন্তরালে আর একটি অর্থ গূঢ় থাকিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, সেখানে এই অলঙ্কারের ক্ষেত্র। সূক্ষ্ম, ব্যাজস্তুতি, কাব্য-স্মৃতি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা, আক্ষেপ প্রভৃতি অলঙ্কার এই শ্রেণী-ভুক্ত। পর্যায়োক্তি অলঙ্কারও এই শ্রেণীতে পড়িবে; তবে অন্য কারণে আমরা পৃথক্‌ভাবে উহার বিচার করিয়াছি।

বিবিধ নামে আর এক টিশ্রেণী গণনা করিয়া ভাবিক প্রভৃতি অলঙ্কার তাহার মধ্যে ধরা যাইতে পারে।

অনেকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারকে গূঢ়ার্থ-মূল অলঙ্কারের মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। আমাদের মতে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার উহাদের কোনও শ্রেণীতেই পড়ে না। উহার স্বতন্ত্র মহিমা বিদ্যমান, আসলে উহাই কাব্যের প্রাণ-ভূত সৌন্দর্য। দণ্ডীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি,—উহাই কাব্যের আদ্য অলঙ্কার।[১] স্বভাবোক্তি মানুষের প্রীতি-সিক্ত চিত্তে আপন প্রসন্নতায় ফুটিয়া উঠে, তাহা কেবল আদ্যকালের নয়, তাহা নিত্যকালের। তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সহজ সম্পর্ক রহিয়াছে সহজ মানুষটির এবং সহজ প্রকৃতির।

আধিকারিক প্রয়োগ

বাঙ্গালা সাহিত্যে কয়েকটি অলঙ্কার সমগ্র বিষয়বস্তুকে অধিকার করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। দশরূপকে ব্যবহৃত 'আধিকারিক বস্তু'রই[২] ন্যায়, অথবা কাব্যালোকে ব্যবহৃত 'আধিকারিক রসে'র ন্যায় ইহাদিগকে আধিকারিক অলঙ্কার রূপে পরিচিত করা যাইতে পারে। রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি—আধিকারিক অলঙ্কার হইতে পারে। একই অলঙ্কার প্রাসঙ্গিক ও আধিকারিক দুই রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং সর্বত্রই অলঙ্কাররূপে তাহাদের লক্ষণ অভিন্ন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'[৩] বা 'দুঃসময়'[৪]

১। কাব্যাদর্শ, ২।৮ ২। দশরূপক, ১।১১

৩। প্রভাতসঙ্গীত ৪। কল্পনা

কবিতা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নির্ঝর বা বিহঙ্গের রূপ আরোপ করিয়াই রচিত হইয়াছে। এখানে অলঙ্কারটির আধিকারিকরূপে প্রয়োগ হইয়াছে।

তাহা হইলে অলঙ্কার-সমূহের মুখ্য ভেদ মাত্র দুই প্রকার—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। অর্থালঙ্কারসমূহের আর এক মুখ্য ভেদ হইতে পারে—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। কাব্যাদর্শে দণ্ডী সর্বপ্রথম এই ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন[১] এবং স্বভাবোক্তিকে বলিয়াছেন কাব্যের আদ্য অলঙ্কার। স্বভাব-বর্ণন অর্থাৎ জাতি-গুণ-ক্রিয়া-দ্রব্যময় বস্তুর স্বরূপ বর্ণন স্বভাবোক্তি। স্বভাবের সরল স্বচ্ছ প্রকাশে ইহার বৈশিষ্ট্য। সালঙ্কার বর্ণনা হইতেছে বক্রোক্তি, উহা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গী-সহকারে উক্তি।[২] এই শেষ সংজ্ঞা কুন্তকের। উপমা, অর্থান্তরন্যাস, একাবলী, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি বিভিন্নশ্রেণীর যাবতীয় অর্থালঙ্কার বক্রোক্তির রূপভেদ। এই দুই ভাগকে মান্য করিয়া আমরা স্বভাবোক্তিকে প্রথম অর্থালঙ্কার-রূপে বর্ণনা করিব।

১। "বিভিন্ন দ্বিধা স্বভাবোক্তি র্বক্রোক্তি শ্চেতি বাঙ্ময়ম্।" —কাব্যাদর্শ, ২।৩৬৩

২। "বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গী-ভণিতি রুচ্যতে ॥" —বক্রোক্তিজীবিত, ১।১০

তৃতীয় অধ্যায়

শব্দালঙ্কার

শব্দ হইতেছে অর্থের ধ্বনি-সঙ্কেত, সঙ্কেতিত হইতেছে অর্থ। শব্দের তাই দুইটি অংশ—শ্রুতি-গোচর ধ্বনি (Sound) এবং মনোগোচর অর্থ (Sense)।

শব্দ অর্থাৎ উহার স্থূলরূপ ধ্বনির আশ্রয়ে যে সকল সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে বলে শব্দালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার শব্দের পরিবর্তন সহ্য করিতে পারে না। কারণ, সৌন্দর্য একান্তভাবে শব্দগত বলিয়া সমার্থক অন্য শব্দের ব্যবহারেও বিশিষ্ট ধ্বনি-রূপ এবং তাহার সহিত তাহার আশ্রিত অলঙ্কার নষ্ট হইয়া যায়। 'চল চপলার' না বলিয়া 'অস্থির বিদ্যুতের' বলিলে, কিংবা 'বই বাজারে কাটে না, কাটে পোকায়' না বলিয়া 'বই বাজারে বিক্রি হয় না, পোকায় নষ্ট করে' বলিলে কোন চমৎকারিত্ব থাকে না, অলঙ্কারও হয় না। শব্দশ্লেষে তো শব্দের পরিবর্তন হইতেই পারে না, কারণ সমানভাবে দ্ব্যর্থযুক্ত প্রতিশব্দ কোথায় মিলিবে?

ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি এই পাঁচটি বাঙ্গালার শব্দালঙ্কার। পুনরুক্তবদাভাস বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাসই আসল শব্দালঙ্কার। আধুনিক সাহিত্যে যমক ও শ্লেষের আদর কমিয়া গিয়াছে।

(১)

ধ্বন্যুক্তি

বর্ণ, শব্দ বা বাক্যের ধ্বনিরূপ দিয়া অর্থের উক্তি অর্থাৎ আভাসে প্রকাশ হইলে, সেই বিশিষ্ট সৌন্দর্যের নাম ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কার।

ইহাতে ভাবানুকারী যে কোন প্রকার উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রয়োগ করিলেই চলে; বর্ণের পুনরাবৃত্তি একান্ত আবশ্যক নহে। শব্দ বা বাক্য শুনিলেই কানের তৃপ্তির সহিত যখন চিত্তে অর্থের ব্যঞ্জনা হয়, স্পষ্ট অর্থোপলব্ধি হয়তো পরে আসে, তখনই এই অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়। কুন্তক শব্দের গীতধর্মিতার কথা

বলিয়াছেন, উহা "কাব্যজ্ঞগণের হৃদয়ে সঙ্গীতের ন্যায় আনন্দ জন্মাইয়া থাকে।"[১]

বর্ণ বা শব্দের ন্যায়, বাক্যাংশ, বাক্য, অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ সর্বত্রই এই ধ্বন্যুক্তির সৌন্দর্য থাকিতে পারে। তবে শব্দ সম্বন্ধে বলা যায়, বাঙ্গালায় অর্থযুক্ত শব্দ এবং অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দ উভয়বিধ শব্দদ্বারাই এই সৌন্দর্য সৃষ্ট হয়। বাঙ্গালায় এই প্রসঙ্গে ধ্বন্যাত্মক শব্দের গঠন ও প্রয়োগ-কৌশল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদাহরণ :—

[এক] **স্বরবর্ণ দ্বারা**

(১) "ওদের ছেলেটা	আমাদের ছেলেটি
খায় যেন এতটা	খায় যেন এতটি
নাচে যেন ভালুকটা।	নাচে যেন ঠাকুরটি।"

—ছেলেভুলান ছড়া

এখানে 'আ' ও 'ই' ধ্বনি যথাক্রমে অভিপ্রেত অর্থ অবজ্ঞা বা আদর বুঝাইতেছে।

(২) "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে"—রবীন্দ্রনাথ (বর্ষামঙ্গল)

এখানে 'ঐ' ধ্বনি দ্বারা এবং ছন্দের পর্ব-ধ্বনি দ্বারা বর্ষায় আগমনকে ধ্বনিত করা হইয়াছে।

[দুই] **ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা**

"বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্ন দল"

—রবীন্দ্রনাথ (শা-জাহান)

যুক্তবর্ণ 'ন্ন'-এর আকস্মিক আঘাতে ধ্বনি আশ্চর্যভাবে 'ছিন্ন'—এই অর্থ ব্যক্ত করিয়াছে।

[তিন] **শব্দদ্বারা**

"শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জন,
সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ; দেখেছি

১। বক্রোক্তিজীবিত, বৃত্তি, পৃঃ ২৭

দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার।"

—মধুসূদন দত্ত (মেঘনাদবধকাব্য, ১ম সর্গ)

এখানে 'গর্জন', 'সিংহনাদ', 'কল্লোল', 'ইরম্মদ' এবং 'টঙ্কার' যথাক্রমে অভিপ্রেত অর্থকে ধ্বনিত করিয়াছে। 'ডাক' বা 'ঢেউ' প্রভৃতি সমার্থক শব্দের প্রয়োগে এই ভাবানুকারী সৌন্দর্য থাকিত না।

[চার]

বাক্যাংশ দ্বারা

উপরের উদাহরণে 'মেঘের গর্জন' ও 'জলধির কল্লোল' কিঞ্চিৎ ব্যাপিত্ব বা ধীরগতি, 'ছুটিতে পবনপথে' ইরম্মদের আকস্মিক ছোটা বা দ্রুতগতি, এবং 'কোদণ্ড টঙ্কার' বীরবাহুর মহাধনুর জ্যা-ধ্বনিকে ফুটাইয়াছে। 'ঘোর ঘর্ঘর' ধ্বনির সহিত 'টঙ্কার'-ধ্বনির কোন মিল নাই। কাজেই এখানে উহার ব্যবহার দোষের হইয়াছে বলিতে হইবে, অথবা উহাকে অনুক্ত ধাবমান রথচক্রের ধ্বনি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

[পাঁচ]

বাক্য দ্বারা

বাক্য-গত ধ্বন্যুক্তিতেই প্রকৃত চমৎকারিত্ব দেখা যায়।

(১) তিন-এর উদাহরণের সমগ্র বাক্যটি। 'শুনেছি রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জন......' বাক্য-গত ধ্বন্যুক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হইয়াছে।

(২) "এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।"

— রবীন্দ্রনাথ (দুঃসময়)

এই রচনায় ধ্বন্যুক্তির চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। রোমান্টিক স্বপ্নাবেশ এবং নূতন মহাজীবনের আহ্বান বৈপরীত্য-সূত্রে যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ধ্বনিত হইয়াছে। বিশালতা বুঝাইয়া 'সাগরের' সহিত

ধ্বনিসাম্য রাখিবার জন্য ইচ্ছাপূর্বক ব্যাকরণ লঙ্ঘন করিয়া 'অজগর'কে 'অজাগর' করা হইয়াছে। এখানে অর্থ গ্রহণ করিবার পূর্বেই ধ্বনিদ্বারা তাহার উপলব্ধি ঘটে।

ছন্দ এই ধ্বন্যুক্তির বিশেষ সাহায্য করে। ছন্দ তো প্রকৃতপক্ষে পর্ব-নিয়মিত ধ্বনি, ভাবকে রূপ দিবার জন্যই তাহার ব্যবহার।

ছন্দের এই শক্তির উদাহরণ-স্বরূপ 'ছন্দ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে নিদ্রিতা রাধিকার বর্ণনাটি তুলিয়াছেন,—

(৩) "রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

বাক্যাংশ ও বাক্য-গত উদাহরণে প্রায়শঃ অনুপ্রাস এবং ক্বচিৎ যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়। অনুপ্রাসের সৌন্দর্য বিভিন্ন শব্দাংশের ধ্বনি-সাম্যে, যমকের সৌন্দর্য ভিন্নার্থ-যুক্ত দুইটি শব্দের ধ্বনিসাম্যে, আর ধ্বন্যুক্তির সৌন্দর্য উভয়কে লইয়া বাক্যের সমগ্র ধ্বনিদ্বারা মূল অর্থের দ্যোতনায়। তাহা ছাড়া রসানুকূল যে কোন প্রকার উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রয়োগেই ধ্বন্যুক্তি হইতে পারে। অনুপ্রাস হইবার জন্য কিন্তু বিভিন্ন শব্দের বর্ণসাম্য চাই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কৃত মেঘনাদবধকাব্যের প্রারম্ভাংশের ধ্বনি-বিশ্লেষণটি উল্লেখযোগ্য। প্রারম্ভাংশ এই প্রকার,—

(৪) "সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি! অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?" —মধুসূদন দত্ত

মন্তব্যাংশ এই,—"প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল—'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু।' তারপরে তার অকালমৃত্যুর

সংবাদটি যেন ভাঙ্গা রণ-পতাকার মত ভাঙ্গা ছন্দে ভেঙ্গে পড়্‌ল—'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।' তারপরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করল,—'কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি!' তারপরে আসল কথাটা, যেটা সব চেয়ে বড় কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা স্বচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ-গর্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হ'ল—'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি?"

(৫) "গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে।
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত।" —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ঝর্ণা)

হরিণীর এবং ঝরণার লাস্যময় গতি স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়াছে।

(৬) "চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর ঘর!
ঘর ঘর ক্ষীর-সর,—আপনার নির্ভর!" —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
(চরকার গান)

এখানে চরকার ঘর্ঘর ধ্বনি তাল রাখিয়া সর্বত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

বাঙ্গালায় ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে অনুকরণাত্মক, এইগুলি ধ্বনি অর্থাৎ অব্যক্ত শব্দের ন্যায় বস্তু, ভাব, গুণ, ক্রিয়া সকলেরই অনুকরণ করে। এইগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ, সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়ের সহিত ইহাদের কোন যোগ নাই। ইহারা বাঙ্গালা ভাষার এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহাদের সহায়তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই ভাব, গুণ বা ক্রিয়ার সূক্ষ্ম দ্যোতনা এবং ছবির রস ফোটান সম্ভবপর নয়। এইগুলি যেমন গুণাদির অনুকরণ করে, তেমন সাধারণতঃ দুইবার এবং কখনও বা তিনবার আবৃত্ত হইয়া ধ্বনিসাম্যের ফলে ঝঙ্কারেরও সৃষ্টি করে। মূল শব্দে ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণের ঈষৎ পরিবর্তন দ্বারা অর্থের আরও সূক্ষ্মভেদ সূচনা করা হয়। অর্থের বিশিষ্টতা-অনুযায়ী এইগুলির উচ্চারণ-স্থানেরও বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

(১) "লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা।" —ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল)

এখানে দ্বিতীয় চরণে 'ছলচ্ছল'-দ্বারা গঙ্গা-জলের নৃত্যশীল গতি, 'টলট্টল'-

দ্বারা জলের স্বচ্ছতাগুণ এবং ‘কলকল’-দ্বারা জলের অব্যক্ত শব্দ দ্যোতিত হইতেছে।

(২) “গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল,
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥”—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (ইংরাজী নববর্ষ)

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে—‘এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত।’

(৩) “সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা,”—রবীন্দ্রনাথ (বলাকা)

ঝল্‌ঝল্—ঝল্‌মল্—ঝিল্‌মিল্—ঝিলিমিলি। প্রথমে ‘ম’, পরে একটি ই, পরে আরও একটি ই-দ্বারা ক্রমশঃ অর্থের সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটান হইয়াছে। এখানে অর্থ—তরল পদার্থের দীপ্তি, কিন্তু একটানা নয়, পর্যায়ক্রমে দীপ্তি, সে দীপ্তি মৃদু, আরও মৃদু। তুলনীয়—‘ঝিকিমিকি উষা’। এখানে ‘ঝিলমে’র সহিত ধ্বনিসাম্যও লক্ষণীয়।

(৪) ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বারা ধ্বন্যুক্তির এক আশ্চর্য উদাহরণ রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে নিয়ে দেওয়া হইল,—

“পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত পূরেন উদর সাধের মত।
পায়স-পয়োধি সপ্‌ সপিয়া পিষ্টক পর্বত কচ্‌ মচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চোষিয়া কচর্ মচর্ চর্ব্য চিবিয়া।
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢুলিয়া।
লট পট জটা লপটে পায় ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর্ গর্ গর্ গরজে ফণী দপ্‌ দপ্‌ দপ্‌ দীপয়ে মণি।
ধক্ ধক্ ধক্ ভালে অনল তর্ তর্ তর্ চাঁদ মণ্ডল॥
সর্ সর্ সর্ বাঘের ছাল দল মল দোলে মুণ্ডের মাল।
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল তা তা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল ডিম ডিম বাজে ডমরু ভাল।
ভভম্ ভভম্ বাজয়ে শিঙ্গা মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥”

—অন্নদামঙ্গল

প্রথম অংশে শিবের ভোজনের বর্ণনা, পরবর্তী অংশে আনন্দোন্মত্ত শিবের নৃত্য-বর্ণনা। এ-যেন ধ্বনির যাদুঘর, ধ্বনিশিল্পের যাদুকর ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি।

এখানে জটা, জাহ্নবী, মুণ্ডমালা পর্যন্ত সকলই যেন সজীব হইয়া নৃত্য করিতেছে। বর্ণনায় কেবল ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে।

(৫) "ঝর্‌ছে ঝর্ঝর, ঝর্‌ছে ঝম্‌ঝম্,
বজ্র গর্জায়, ঝঞ্ঝা গম্ গম্,
লিখ্‌ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিনলোক বম্ ববম্ বম্।" —সত্যেন্দ্র দত্ত (ছন্দ-হিল্লোল)

ছন্দ-হিন্দোলে বর্ষার বর্ণনা।

(৬) "টং-টং-ভোঁ-ভস্
টু-ডাউন ছাড়ে ব্যস্!
ভস্ ভস্ ঢক্কোর,
চলে খায় টক্কোর।
ঘ্যেস্ ঘ্যেস্ ঘ্যেস্ ঘ্যেস্;
গদিটায় দিই ঠেস্।" —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রেলগাড়ীর যাত্রা আরম্ভের বর্ণনা।

ইংরাজীর Onomatopoeia অলঙ্কার এই ধ্বন্যুক্তির অন্তর্গত।

(২)

অনুপ্রাস

একই বাক্যে অদূরবর্তী বিভিন্ন শব্দে একটি বা একাধিক বর্ণের আবৃত্তি হইলে যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তাহার নাম অনুপ্রাস অলঙ্কার।

বর্ণের আবৃত্তি অর্থ বর্ণের একাধিকবার উচ্চারণ—বর্ণ-সাম্য বা বর্ণ-সাদৃশ্য। দূরবর্তী দুইটি শব্দের মধ্যে বর্ণসাম্য গ্রাহ্য হয় না; কারণ, অনেক পরে আবৃত্ত হইলে প্রথম উচ্চারিত বর্ণের স্মৃতি ও সংস্কার দুর্বল হইয়া যায় বলিয়া তাহাতে কোন চমৎকারিত্ব থাকে না।

সাধারণতঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্যেই চমৎকারিত্ব দেখা যায়; কিন্তু স্বরবর্ণের সাদৃশ্যও স্থানে স্থানে সুখাবহ হয়।

বর্ণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিদ্বারা রসানুকূল সৌন্দর্যের সৃষ্টি না হইলে অনুপ্রাস কাব্যের অলঙ্কার না হইয়া ভার-ভূত হয়। বস্তুতঃ অনুপ্রাস শব্দের অর্থ "রসাদির অনুগত প্রাস অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ন্যাস বা বর্ণপ্রয়োগ।" অবশ্য অন্যভাবেও শব্দটির অর্থ করা যাইতে পারে। অনু অর্থ পশ্চাৎ, প্রাস অর্থ নিক্ষেপ বা প্রয়োগ। একটি বর্ণের পশ্চাৎ ঐ বর্ণের পুনরায় প্রয়োগই অনুপ্রাস।

অনুপ্রাস মাত্রই বৃত্ত্যনুপ্রয়াস। বৃত্তি-ঘটিত যে অনুপ্রাস, তাহাই বৃত্ত্যনুপ্রাস। বৃত্তি শব্দের অর্থ 'রস-ব্যঞ্জক বর্ণ-রচনা'। অতএব কেবল বর্ণসাদৃশ্য হইলেই বৃত্ত্যনুপ্রাস হয় না, সদৃশবর্ণগুলি বর্ণনীয় বিভিন্ন রস, ভাব বা গুণের পরিব্যঞ্জক ও প্রকাশক হওয়া চাই। এই বৃত্তি কার্যতঃ রীতি বা রচনা-গুণ। প্রাচীনেরা অনেকে বৃত্তিকে উপনাগরিকা, পরুষা ও কোমলা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। মাধুর্যগুণ-ব্যঞ্জক বর্ণ-সমাবেশের নাম উপনাগরিকা; ইহাতে ট, ঠ, ড, ঢ-এর ব্যবহার হয় না এবং সানুনাসিক সংযুক্তধ্বনির বাহুল্য থাকে। ওজোগুণ-ব্যঞ্জক বর্ণসমাবেশের নাম পরুষা; ইহাতে ট, ঠ, ড, ঢ-এর ব্যবহার হয় এবং অননুনাসিক সংযুক্তধ্বনির বাহুল্য থাকে। প্রসাদগুণ-ব্যঞ্জক বর্ণ-সমাবেশের নাম কোমলা বৃত্তি; ইহাতেও ট, ঠ, ড, ঢ-এর ব্যবহার হয় না এবং সংযুক্তধ্বনির ব্যবহার অল্প হয়। এই তিন বৃত্তিকেই যথাক্রমে বলা হয় বৈদর্ভী, গৌড়ী এবং পাঞ্চালী রীতি। ছেকানুপ্রাস বা অন্ত্যানুপ্রাস বা যে অনুপ্রাসই হউক, সকলই বৃত্ত্যনুপ্রাসের সরল ভেদ মাত্র।

স্বরবর্ণের সাদৃশ্য

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন স্বর-সাম্যে প্রকৃত কোন বৈচিত্র্য নাই, তাই উহা অলঙ্কার নহে।[১] ইংরাজীতে উহা শব্দের আদিতে স্থিত হইলে অলঙ্কার বালয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় উহা অনেক স্থলেই অলঙ্কার সন্দেহ নাই; যথা—

(ক) আদ্য স্বর-ধ্বনি ঃ—

(১) "ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে," —রবীন্দ্রনাথ

(২) "আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া," —ঐ

১। "স্বরমাত্রেঽপি সাদৃশ্যং বৈচিত্র্যাভাবান্ন গণিতম্।" —সাহিত্যদর্পণ, ১০ম পরিচ্ছেদ

(৩) "উল্লাস-উতরোল বেণুবন-কল্লোল," —রবীন্দ্রনাথ

যেখানে স্বরধ্বনি দুইবার মাত্র উচ্চারিত হইয়াছে, সেখানে চমৎকারিত্ব নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট।

(খ) মধ্য স্বর-ধ্বনি :—

বলা বাহুল্য, কেবল মধ্যস্থ অ-ধ্বনিদ্বারা কোন বৈচিত্র্য হয় না ; অন্য ধ্বনি-দ্বারা হইতে পারে ; যথা—

(১) "যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার" —রবীন্দ্রনাথ

(২) "এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে" —ঐ

(৩) "নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত,
ধীর সমীর বিরাজে ॥" —মদনমোহন তর্কালঙ্কার

(৪) "উর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে," —রবীন্দ্রনাথ

(৫) "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা।
শ্যামগম্ভীর সরসা।" —রবীন্দ্রনাথ

প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণটির আ-ধ্বনিগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'দুর্দাম' ও 'দুর্বার' এবং 'অজাগর' ও 'সাগর'-এর আ-ধ্বনি বিশালতা বুঝাইয়া চমৎকার অর্থদ্যোতনা ঘটাইয়াছে। অনুপ্রাস-অলঙ্কারের জন্য ইচ্ছাপূর্বক ব্যাকরণ লঙ্ঘন করিয়া 'দুর্দম' ও 'অজগর'কে যথাক্রমে 'দুর্দাম' ও 'অজাগর' করা হইয়াছে। শেষের উদাহরণ তিনটিতে যথাক্রমে ই-কার বা ঈ-কার উ-কার এবং ঐ-কার বা ঔ-কারের ধ্বনির তাৎপর্য লক্ষণীয়।

(গ) অন্ত স্বর-ধ্বনি :—

ইহার উদাহরণ পরবর্তী অংশে শব্দের অন্ত্যবর্ণের অনুপ্রাস-প্রসঙ্গে পাওয়া যাইবে।

ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্য

অনুপ্রাসের চমৎকারিত্ব এখানে সহজেই ধরা পড়ে। ছয়টি ভাগে উদাহরণ দিয়া দেখান হইতেছে।

[প্রথম] একটি বর্ণের সাদৃশ্য— সরল অনুপ্রাস—

ইহাতে প্রধানতঃ একটি বর্ণের দুই, তিন বা বহু বার আবৃত্তি হয়।

(ক) বাঙ্গালায় উচ্চারণে আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে বলিয়া আদ্যবর্ণের অনুপ্রাস সহজেই কানে তৃপ্তি দেয় ; যথা—

(১) "কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল," —মদনমোহন তর্কালঙ্কার

(২) "সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ-করালে।" —বঙ্কিমচন্দ্র

(৩) "কেতকী-কেশরে কেশপাশ কর সুরভি," —রবীন্দ্রনাথ

(৪) "বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি।" —শরৎচন্দ্র

একটি বর্ণ বহুবার ধ্বনিত হইলে রসানুকূল চমৎকারিত্ব অনেক সময়ে কমিয়া যায়, দৃষ্টি হয় বহির্মুখী।

(খ) শব্দের অন্ত্যবর্ণের অনুপ্রাস—

(১) "সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।" —বঙ্কিমচন্দ্র

(২) "দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী।" —বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙ্গালায় শব্দের অন্ত্য অ-কার সাধারণতঃ উচ্চারিত হয় না বলিয়া এইরূপ ক্ষেত্রে অনুপ্রাস সকল সময়ে শ্রুতি-সুখকর হয় না। কিন্তু যেখানে উহা উচ্চারিত হয়, সেখানে মনোহারিত্ব সুস্পষ্ট ; যথা—

(৩) "চূতমুকুলকুল সঞ্চলদলিকুল
গুন গুন রঞ্জন গানে। —মদনমোহন তর্কালঙ্কার

এখানে যথাক্রমে 'ল' ও 'ন' এই দুই অন্ত্যবর্ণের অনুপ্রাস।

(৪) "পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল চল লো বনে।" —মধুসূদন দত্ত

এখানে 'ল' এই অন্ত্যবর্ণের অনুপ্রাস।

(গ) একই বর্ণ একই বাক্যে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে থাকিয়াও এই অনুপ্রাসের সৃষ্টি করে ; যথা—

"একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে !"

—মধুসূদন দত্ত

বিভিন্ন স্থানে স্থিত 'ক' বর্ণের সাম্য লক্ষণীয়।

[দ্বিতীয়] অনেক বর্ণের অনেক বার সাদৃশ্য--গুচ্ছানুপ্রাস—

ব্যঞ্জনবর্ণের গুচ্ছ অর্থাৎ একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একই ক্রমে অনেক বার ধ্বনিত হইলে এই অনুপ্রাস হয়। ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ যুক্ত বা অযুক্ত ভাবে ধ্বনিত হইতে পারে।

অযুক্তব্যঞ্জনের গুচ্ছ

(১) "কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই বনে।"

এখানে 'রাই' তিনবার ধ্বনিত হইয়াছে। শেষের বর্ণটি স্বরবর্ণ হইলেও এখানে প্রায় ব্যঞ্জনবর্ণের ন্যায় কাজ করিতেছে।

(২) "মদন-নিধন করণ-কারণ, চরণ-শরণ লয়।" —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(৩) "না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।"

—রবীন্দ্রনাথ

(৪) "বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী যার খনি সুষমার"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(৫) "কে রে করালকামিনী, মরাল-গামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবন-ভামিনী,
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
দামিনী-জড়িত হাস।
কে রে যোগিনী-সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণ-তরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ।"

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্রথমাংশে 'মিনী' এই অযুক্তব্যঞ্জন-গুচ্ছের এবং শেষাংশে 'ঙ্গ' এই যুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইয়াছে।

যুক্তব্যঞ্জনের গুচ্ছ

(১) উপরের (৫)-এর উদাহরণের শেষাংশ।

(২) "নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।" —গোবিন্দ দাস

'ন্দ'-এর এবং 'নন্দ'-এর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি।

(৩) "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা" —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(৪) "সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।" —মধুসূদন দত্ত

(৫) "নন্দকুলচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" —কালিদাস রায়

[তৃতীয়] অনেক বর্ণের একবারমাত্র সাদৃশ্য—ছেকানুপ্রাস বা একানুপ্রাস

ইহা হইতেছে গুচ্ছ-অনুপ্রাসের একাবৃত্তি। একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একই ক্রমে একবার মাত্র আবৃত্ত অর্থাৎ দুইবার মাত্র ধ্বনিত হইলে ছেকানুপ্রাস বা একানুপ্রাস হয়।

ছেকানুপ্রাস সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের দেওয়া নাম। ছেক অর্থ বিদগ্ধ বা পণ্ডিত। পণ্ডিতগণের ব্যবহৃত অনুপ্রাস বলিয়া ঐরূপ নাম। ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে একবার মাত্র আবৃত্তি। এই জন্য একানুপ্রাস (তুলনীয়—'একাবলী') নাম দিলে পরিচয় সহজ ও সার্থক হয়।

আমাদের মনে হয়, যেখানে শব্দ দুইটির মধ্যে অনেকাংশে উচ্চারণ-সাম্য থাকিয়া অর্থের কিঞ্চিৎ বৈষম্য থাকে, সেখানেই বাঙ্গালায় ইহার সার্থকতা।

উদাহরণ—

(১) "অস্ত গেল রোষ উদয় রস।" —ভারতচন্দ্র

রোষ—ক্রোধ, ব্যঞ্জনায় সূর্যাস্তের রক্তরাগ।

রস—ভালবাসা, ব্যঞ্জনায় চন্দ্রোদয়ের রক্ত আভা।

(২) "অনুস্বর ধনুঃশর নহে মহারাজ,
কেবল টঙ্কার মাত্র।" —রবীন্দ্রনাথ

বাঙ্গালা উচ্চারণে 'স্বর' ও 'শর'-এর ধ্বনি-সাম্য স্বীকৃত হয়।

(৩) "কৃপা চাহি না হে কৃপাণ চেয়েছি।"

কৃপা—অনুগ্রহ, কৃপাণ—খড়্গ, আত্মপ্রত্যয়।

(৪) "যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে।" —কৃষ্ণকমল গোস্বামী

(৫) "জাতি লইয়া বজ্জাতির খেলা শেষ হইয়াছে।"

(৬) "যত পায় বেত, না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।"

—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের চলিত কথা বা প্রবাদসমূহেও বহু উদাহরণ পাওয়া যায় ; যথা—'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী', 'খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা', 'তিলকে তাল করা', 'পলকে প্রলয়', 'পেটে খেলে পিঠে সয়', 'পুঁজি নেই পাঁজি আছে', 'কুলে কালি দেওয়া' ইত্যাদি।

যদি সকল স্বরবর্ণের সাদৃশ্য-সহ মাত্র শেষ ব্যঞ্জনবর্ণটির সাদৃশ্য থাকে এবং একবার মাত্র আবৃত্ত হয়, তাহা হইলে প্রায় অনুরূপ চমৎকারিত্ব জন্মে ; যথা—

(১) "আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥" —ভারতচন্দ্র

(২) "বৃহৎ চৌর্য প্রায় সে শৌর্য—এমন কথা চোরেই বলে।"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(৩) "যাহাতে দশের সংযোগ, তাহাতেই যশের সংযোগ, ইহাতে সংশয় কি।" —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চলিত কথা বা প্রবাদসমূহেও বহু উদাহরণ পাওয়া যায় ; যথা—'ধরাকে সরা জ্ঞান করে', 'হাল ও চাল', 'পুত নয় ভূত', 'মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা', 'আগে কাজী, পরে হাজী, শেষে পাজী', 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ' ইত্যাদি।

অবশ্য শব্দ দুইটির এই অর্থ-গত লক্ষণ না থাকিলেও ছেকানুপ্রাস হয় এবং তাহাতেও চমৎকারিত্ব থাকে। উদাহরণ—

(১) "মরণ সময়ে কি কাজ ভূষণে—
এ ভূষণ নাহি যাবে কভু সনে।" —কৃষ্ণকমল গোস্বামী

(৩) "প্রভাকর প্রভা-তে প্রভাতে মনোলোভা।" —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্রভা-তে—জ্যোতিতে, প্রভাতে—প্রাতঃকালে।

(৩) "আর এক ফল আছে নাম আনারস,
নন্দন কানন থেকে বুঝি আনা রস।"

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪) "বকুল বনে পবন হত সুরার মত সুরভি—
পরাণ হত অরুণ-বরণি। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রথমে দুইটি ছেকানুপ্রাস, পরে একটি বৃত্ত্যনুপ্রাস।

(৫) "মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল-লারা' কন হাত
নেড়ে" —নজরুল ইসলাম

উপরের উদাহরণগুলি অযুক্ত ব্যঞ্জনের, যুক্ত ব্যঞ্জনের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) "হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণ-ভূমে।" —মধুসূদন দত্ত

(২) "জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা।"
—রবীন্দ্রনাথ

(৩) "মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥" —গোবিন্দ দাস

(৪) "আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের" —প্রেমেন্দ্র মিত্র

[চতুর্থ] শ্রুত্যনুপ্রাস

ইহার আবেদন অতি সূক্ষ্ম। বাঙ্গালায় বাক্যের গঠন এবং উচ্চারণ শিথিল বলিয়া বাংলায় ইহার সৌন্দর্য ক্বচিৎ লক্ষ্য করা যায়। সমাস-বহুল ধ্বনি-গাম্ভীর্য-পূর্ণ সংস্কৃত বাক্যে ইহার সার্থকতা আছে।

কণ্ঠ বা তালু প্রভৃতি একই স্থান হইতে উচ্চারিত ব্যঞ্জন-ধ্বনির শ্রুতিসুখকর সমাবেশকে **শ্রুত্যনুপ্রাস** বলে।

(১) "**চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা** যেমতি **জাহ্নবী**," —মধুসূদন দত্ত

এখানে তালু হইতে উচ্চারিত 'চ' 'জ' 'ছ' 'জ' ধ্বনির সমাবেশ লক্ষ্য করিবার।

(২) "মোরে হেরি' প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইলা সম্মুখে।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে মধ্য চরণে দন্ত হইতে উচ্চারিত 'ধ' 'ধ' 'দ' 'ন' 'দ' 'ন' ধ্বনির সমাবেশ লক্ষণীয়।

(৩) "কহিছে শিখরী, কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হইলাম হে অচল," —দাশরথি রায়

(৪) "ঘোরাননা ত্রি-নয়না, ভালে শোভে বালশশী।"
—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(৫) "কল্‌কে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বলছে আলো খাস্ গোলাসে,
স্বভ্রচিকণ টিক্‌লি জলের ঝল্‌মলিয়ে যায় বাতাসে ;"
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এখানে প্রথম বাক্যে কণ্ঠ হইতে এবং দ্বিতীয় বাক্যে তালু হইতে উচ্চারিত তিনটি ধ্বনির সমাবেশ লক্ষণীয়।

সানুনাসিক সংযুক্ত বর্ণে—

(৬) "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে দন্ত হইতে উচ্চারিত 'ন'-এর সঙ্গে যথাক্রমে 'ধ' 'দ' ও 'থ'-এর সমাবেশ লক্ষণীয়।

(৭) "বঞ্চনা ভয় লাঞ্ছনা যত জঞ্জালজাল ঝঞ্ঝা শত"

এখানে তালু হইতে উচ্চারিত 'ঞ'-এর সঙ্গে যথাক্রমে 'চ' 'ছ' 'জ' ও 'ঝ' বর্ণের সমাবেশ লক্ষণীয়।

বাঙ্গালা বাক্যে শ্রুত্যনুপ্রাসের প্রয়োগ অতি বিরল বলিয়া বাঙ্গালা অলঙ্কারগ্রন্থে ইহা গণনা না করিলেও চলে।

[পঞ্চম]

মালানুপ্রাস

ইহা হইতেছে অনুপ্রাসের মালা।

যেখানে একাধিক অনুপ্রাস একই বাক্যে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্বনির পরিবর্তন ও সামঞ্জস্য ঘটায়, সেখানেই মালানুপ্রাস।

অনুপ্রাসের বিচিত্র ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এখানেই। উদাহরণ—

(১) "কুসুম-কুন্তলা মহী মুক্তামালা গলে।" —মধুসূদন দত্ত

এখানে 'ক', 'ম', 'ল' বর্ণের মালানুপ্রাস।

(২) "আজন্ম সাধন-ধন সুন্দরী আমার,
কবিতা কল্পনালতা" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'স', 'ধ', 'ন', 'র', 'ক' 'ল', 'ত'—বর্ণের মালানুপ্রাস। মধ্যে একটি ছেকানুপ্রাস।

(৩) "লাঘবিয়া রাঘবের বীরগর্ব রণে।" —মধুসূদন দত্ত

এখানে 'ঘ', 'ব', 'র', এই তিন বর্ণের বিচিত্র অনুপ্রাসমালা। 'লাঘবিয়া' ও 'রাঘবের' এবং 'রাঘবের' ও 'বীর' এই দুই স্থানে ছেকানুপ্রাস; আবার 'বীর' ও 'গর্ব' এখানেও অনুপ্রাস।

(৪) "ভারত-ভারতীর সারথি চিরধীর
তোমারি পায় ধায় আকুতি বসুধার," —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[ষষ্ঠ] অন্ত্যানুপ্রাস

বাঙ্গালায় ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দের মিল এবং ঐ ছন্দের একটি অপরিহার্য লক্ষণ। তাই বাঙ্গালায় অলঙ্কার-বিচারে অন্ত্যানুপ্রাস বিশেষ ভাবে আলোচ্য নহে। সংস্কৃতের প্রধান ছন্দ বৃত্তছন্দ, তাহাতে শ্লোকের চরণগুলিতে অন্ত্যবর্ণের মিলের কোন আবশ্যকতা নাই, এবং এইজন্য যেখানে মিল থাকে, সেখানে তাহা এক বিশিষ্ট সৌন্দর্য বলিয়া অন্ত্যানুপ্রাস নামে পরিচিত হইয়াছে। সংস্কৃতের অনুসরণে বাঙ্গালায় উহার উল্লেখ করা হয় মাত্র।

বাঙ্গালায় অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার চরণের শেষে থাকে, অনেক সময়ে চরণের অন্তর্গত পর্বশেষেও দেখা যায়; ত্রিপদীর প্রথম দুই পর্বের, অথবা চৌপদীর প্রথম তিন পর্বের শেষে মিল থাকে।

এই অন্ত্যানুপ্রাস বা কবিতার চরণের মিল তিন প্রকারে হয়।

(১) কেবল অন্ত্যস্বরের মিল—

"সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া, এমতি করিল কে ?
আমার অন্তর যেমন করিছে তেমতি হউক সে॥" —চণ্ডীদাস

এইরূপ মিলের প্রয়োগ কমিয়াছে।

প্রথম চরণে প্রথম দুই পর্বের অন্ত্যমিল দ্রষ্টব্য।

(২) ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর হইলে শেষ ব্যঞ্জন ও তাহার পূর্ববর্তী স্বরের মিল—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥" —জ্ঞানদাস

(৩) স্বরান্ত অক্ষর হইলে অন্ত্য ও উপান্ত স্বর ও অন্ত্যস্বরের পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের মিল—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।" —দ্বিজেন্দ্রলাল

মিলের নানা প্রকার ব্যতিক্রমও কবিদের, বিশেষতঃ পূর্বযুগের কবিদের রচনায় দেখা যায়।

অনুপ্রাসের দোষ

অনুপ্রাসের একটি দোষ—বর্ণিত ভাববস্তুর অনুরূপ ধ্বনি-সমাবেশ না হওয়া, দ্বিতীয় দোষ—উহার অতিপ্রয়োগ। বাঙ্গালা সাহিত্যে, বিশেষতঃ মধ্যযুগের সাহিত্যে, এই দ্বিতীয় দোষটি প্রায় ব্যাধির আকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মধ্যে প্রথমে ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন স্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। পৃথক্ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় বলিয়া বাক্যরচনায় অনুপ্রাস ও যমকের ব্যবহার সর্বদাই রসানুকূল হইতে পারে না। কুন্তকও মন্তব্য করিয়াছেন,—প্রযত্ন-বিরচিত শব্দালঙ্কার-প্রয়োগে রচনার ঔচিত্য-হানি হয় এবং শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচকের পরস্পর-স্পর্ধিত রূপ সাহিত্য-গুণ নষ্ট হয়।

সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধে যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,— "কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে বড় মিঠে।"

সুধী ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'অনুপ্রাস'-নামক উপাদেয় গ্রন্থের ভূমিকায় শেষ কথাটি বলিয়াছেন,—"রন্ধনে লবণ না থাকিলে যেমন ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, অথচ মাত্রা অধিক থাকিলে অখাদ্য হয়, অনুপ্রাসও সেইরূপ পরিমিত প্রয়োগে রচনার সৌন্দর্য সাধন করে—ভূরি পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে কর্ণপীড়া উৎপাদন করে।..."

(৩)

যমক

সমোচ্চার্য কিন্তু ভিন্নার্থ-বোধক শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে যমক অলঙ্কার হয়।

সমোচ্চার্য—ধ্বনিসাম্য-যুক্ত, একরূপ বা তুল্যরূপ। যমক অর্থ যুগ্ম। শব্দটির সাধারণতঃ দুইবার প্রয়োগ হয় বলিয়া এইরূপ নাম।

যমকের সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রেই চাতুর্যের নামান্তর।

যমক তিন প্রকার,—আদ্যযমক, মধ্যযমক ও অন্ত্যযমক।

চরণের আদিতে স্থিত হইলে **আদ্যযমক** হয় ; যথা—

(১) "ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে।" —মধুসূদন দত্ত

ঘন—নিবিড়, ঘন—মেঘ।

(২) "আনা-দরে আনা যায় কত আনারস।" —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আনা—চারি পয়সা, আনা—কেনা।

শেষের 'আনারস'—এর সঙ্গে যমক নয়, অনুপ্রাস। কারণ ওখানে 'আনা' শব্দ পৃথক গোটা শব্দ নয়।

(৩) "ভারত ভারত-খ্যাত আপনার গুণে"

(৪) "কমলাসনে কমলা সনে কমলাপতি বিহর।"

সমাসবদ্ধ পদ বলিয়া দুটিকে এক পদ বলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রথম 'কমলাসনে'—কমলের আসনে, দ্বিতীয় 'কমলাসনে'—কমলার সনে অর্থাৎ সহিত।

চরণের মধ্যে স্থিত হইলে **মধ্যযমক** হয় ; যথা—

(১) "পাইয়া চরণ-তরি, তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধু ভব, ভব সে ভরসা॥" —ভারতচন্দ্র

তরি—নৌকা, তরি—উত্তীর্ণ হই, ভব—জন্ম, ভব—মহাদেব।

(২) "যেই করে করে মুখে আহার প্রদান" —নবীনচন্দ্র সেন

করে—হাতে, করে—ক্রিয়াপদ।

(৩) "আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।" —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

রোজ—দিন (ফারসী শব্দ), রোজ—গোলাপফুল (ইংরাজী শব্দ)।

(৪) "কোথা হা হন্ত, চির বসন্ত, আমি বসন্তে মরি।" —রবীন্দ্রনাথ

চরণের অন্তে স্থিত হইলে **অন্ত্যযমক** হয় ; যথা—

(১) "দুহিতা আনিয়া যদি না দেহ।
নিশ্চয় আমি ত্যজিব দেহ॥"

দেহ—দেও (ক্রিয়াপদ), দেহ—শরীর (বিশেষ্য পদ)

(২) "মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥" —ভারতচন্দ্র

উত্তর—প্রতিবাক্য, উত্তর—পর।

(৩) "যত কাঁদে বাছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্।" —কৃষ্ণকমল গোস্বামী
সর—দুধের সর, সর্—সরিয়া যাও।

(৪) "কুসুমের বাস ছাড়ি কুসুমের বাস।
বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় বাস॥"

বাস—আলয়, সৌরভ, অবস্থান।

দ্রষ্টব্য—এক উদাহরণে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন প্রকার যমক—
"অচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণমতি,
কি হবে দুর্গার গতি, যেতে নারি জেতে নারী আমি হে!" —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আবার **সর্বযমকও** আছে, যদিও বাঙ্গালায় বিরল ; যথা—

"কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত-সহকারে,
কান্তার আমোদ-পূর্ণ কান্তসহকারে॥"

প্রথম চরণে—কান্তার—দয়িতার, আমোদ—আনন্দ, কান্ত—স্বামী, সহকারে—সঙ্গে।

দ্বিতীয় চরণে—কান্তার—বনভূমি, আমোদ—সৌরভ, কান্ত—বসন্তকাল, সহকারে—সমাগমে।

সুপ্রযুক্ত হইলে **গদ্যেও** যমকের ব্যবহার খোলে ; যথা—

(১) "নামজাদা লেখকদেরও বই বাজারে কাটে কম, কাটে বেশী পোকায়"।
—প্রমথ চৌধুরী

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কাব্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—"কথিত বাঙ্গালার—সংস্কৃত-মণ্ডিত বাঙ্গালার নহে—এক অসামান্য সম্পদ আছে। এক একটি চলিত কথার বহুরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালা কথিত ভাষায় পাওয়া যায়, সেই সকল

কথার আবার বহুরূপ অর্থ আছে।" তিনি পরেও উল্লেখ করিয়াছেন,—"আশ্চর্যের বিষয় বাঙ্গালী যেরূপ সূক্ষ্মভাবে মস্‌লিন্ বুনিয়াছিল, যেরূপ নিপুণতার সহিত ঢাকার কারিগর সোনার তার দিয়া অলঙ্কার গড়িত, কথিত ভাষায় ছোট ছোট শব্দগুলির মারপেঁচ দেখাইয়া বিশেষরূপে বঙ্গমহিলারা এই ভাষাতে সেইরূপ নানা সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ভাবের বুননি দিয়াছিলেন।" উদাহরণ-স্বরূপ তিনি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর এই পদটি লইয়াছেন,—

"ভাল ভাল বঁধু! ভাল ত' আছিলে?
ভাল সময়, ভাল এসে দেখা দিলে,
আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে, প্রাণসখা দেখা হত না",

এখানে প্রথম 'ভাল ভাল'—বেশ বেশ, দ্বিতীয় 'ভাল'—সুস্থ, তৃতীয় 'ভাল'—উপযুক্ত, চতুর্থ 'ভাল'—উৎকৃষ্টভাবে।

এখানে 'ভাল' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ স্বীকার করিলে অলঙ্কারটি অনুপ্রাস না হইয়া যমক হইবে।

কবিওয়ালাদের যুগের যমকের ঘটা নিম্নের দুইটি উদাহরণে দেখান হইল। এক শব্দের অনেক অর্থে প্রয়োগ এখানে লক্ষ্য করা যাইবে।

"আন তারা[১] ত্বরায় গিরি, নয়নে লুকায়ে রাখি।
হেরিয়ে গগন তারা[২], মনে হ'লো প্রাণের তারা[৩],
শুনেছি তারাকে[৪] নাকি পাঠাবেনা তা'রা[৫],
মায়ের আমার নাম তারা[৬], ত্রিনয়নে তিন তারা[৭],
তারা[৮]-হৃদে তারার[৯] ধারা,
আমি তারায়[১০] দেখে মুদি আঁখি॥"

—অন্ধ চণ্ডী

দশ বার তারা শব্দের প্রয়োগ, কিন্তু অর্থ মাত্র চারি প্রকার। ১, ৩, ৪, ৬, ৮-এর তারা—উমা। ২, ১০-এর তারা—নক্ষত্র। ৫-এর তা'রা—তাহারা। ৭, ৯-এর তারা—চক্ষুর তারা (তারার ধারা—চোখের জল)।

আধুনিক সাহিত্যে বরং মাঝে মাঝে শ্লেষের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু যমকের ব্যবহার খুবই অল্প। এক সময়ে অতিশয় আদৃত থাকিলেও ইহাতে খাঁটি অলঙ্কারের লক্ষণ অল্প বলিয়া, ইহার প্রয়োগ কমিয়া গিয়াছে।

ইংরাজীতে Pun বা Paronomasia অলঙ্কারের দুইটি ভেদ,—একটি আমাদের যমক, অপরটি শ্লেষ। ইংরাজীতে উভয়ই অনেক সময়ে হাস্যরসের বর্ণনায় প্রযুক্ত হয়।

(৪)

শ্লেষ

শব্দ একবার মাত্র প্রযুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থ বুঝাইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়।

শ্লেষ অর্থ আশ্লেষ—সংযোগ, আলিঙ্গন। বাক্যে শব্দটি যেন পাশাপাশি দুইবারই প্রযুক্ত হইয়াছিল ; পরে একরূপতা-হেতু আলিঙ্গিত বা মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, অর্থ বিভিন্নই রহিয়াছে। তাই শ্লেষে একবার মাত্র প্রয়োগ, অর্থ বিভিন্ন ; যমকে নাম দ্বারাই বুঝা যাইতেছে দুইবার (বা বহুবার) প্রয়োগ এবং অর্থ বিভিন্ন। শ্লেষ যমকেরই অনিবার্য পরিণতি। শ্লেষের এই ব্যাখ্যা হইতে আরও বুঝা যাইতেছে যে, শ্লেষে বাক্যের দুইটি অর্থই প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রেত বা বাচ্য হওয়া আবশ্যক।

শ্লেষেও রচনার সৌন্দর্য নাই, রহিয়াছে চাতুর্য। বস্তুতঃ ইহা খাঁটি শব্দালঙ্কার নয়, কারণ শব্দটি একবার মাত্র আবৃত্ত হয় বলিয়া ধ্বনি দ্বারা অর্থ দ্যোতনায় কোন প্রশ্ন উঠে না। তবে এখানে একটি শব্দে দুইটি অর্থ বাচ্য বলিয়া শব্দের পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। শব্দটিকে নিজ ধ্বনিরূপে স্থির রাখিতেই হইবে। তাই শব্দের ধ্বনিরূপের প্রাধান্য-হেতু ইহা শব্দালঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত হয়। যে শ্লেষে শব্দের পরিবর্তন সত্ত্বেও অর্থের বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার নাম অর্থশ্লেষ, তাহা শব্দালঙ্কারের অন্তর্গত নয়। অর্থালঙ্কারের অধ্যায়ে যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা হইবে। বাক্যগত শব্দ-শ্লেষের মধ্যেও অনেক সময়ে অর্থ-শ্লেষের প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্তী কয়েকটি উদাহরণে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। উদাহরণ—

(১) "আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে॥" —মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কালকেতুর পত্নী ফুল্লরার নিকটে সুন্দরী-রূপিণী চণ্ডীর আত্মপরিচয়।

'গুণে' অর্থ—(১)—ধনুকের ছিলায়, (২) স্বভাবের উৎকর্ষে। দুইটি অর্থই এখানে প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রেত। চণ্ডী প্রথমে স্বর্ণগোধা রূপ ধারণ করেন, কালকেতু ধনুকের ছিলায় তাঁহাকে বাঁধিয়া আনেন। দ্বিতীয় অর্থ—কালকেতু আপন স্বভাবের চমৎকারিত্বে আকৃষ্ট করিয়া দেবীকে আনয়ন করেন।

এখানে যেন প্রয়োগ ছিল, 'বান্ধি নিজ গুণে গুণে।' পরে শব্দ-শ্লেষের ফলে উহা হইয়াছে 'বান্ধি নিজ গুণে'। শ্লেষের সকল উদাহরণেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যায় শব্দ-শ্লেষ যমকেরই পরিণতি।

(২) "মধু-হীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।" —মধুসূদন দত্ত

মধু—(১) মধুসূদন দত্ত, (২) মকরন্দ।

রূপকালঙ্কারের জন্য উভয় অর্থই বক্তার অভিপ্রেত; মনকে মধুহীন করো না, কোকনদকে মধুহীন করো না।

(৩) "কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস-দেশে?" —মধুসূদন দত্ত

মানস—(১) মন, (২) মানস নামক সরোবর।

এখানে মূল রূপকটি মানসরূপ মানস সরোবর। উভয় অর্থই প্রাসঙ্গিক।

(৪) "সভাকবি। আমরা সহ্য করব ওঁদের স্বর-বর্ষণ, মহাবীর ভীষ্মের মতো।" —রবীন্দ্রনাথ (শ্রাবণ-গাথা)

বাঙ্গালায় উচ্চারণে 'স্বর-বর্ষণ' ও 'শর-বর্ষণ' একই প্রকার। কাজেই এখানে শব্দের আকৃতি-গত নয়, উচ্চারণ-গত শ্লেষ। উপমার সার্থকতার জন্য উভয় অর্থই এখানে প্রাসঙ্গিক। অর্থ এই—মহাবীর ভীষ্ম যে প্রকার শর-বর্ষণ সহ্য করিয়াছেন, আমরাও সেইপ্রকার স্বরবর্ষণ বা গান সহ্য করিব।

(৫) "বামুন বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান॥" —প্রবাদ

দক্ষিণা—(১) পূজা সমাপ্তির পর প্রাপ্য অর্থ, (২) দক্ষিণা বাতাস।

পূবে হাওয়ায় বাদল, ও তজ্জনিত বান হয়। দক্ষিণা বাতাস বহিলেই বাদল ছাড়িয়া যায় ও বানও চলিয়া যায়।

(৬) "দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরু-ক্ষেত্রে!"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জীবন—(১) জল, (২) প্রাণ।

(৭) কাট্‌ছে বটে—পোকায় কিন্তু
আলমারি কি সিন্ধুকেই।" —দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্লেষ যদি অপ্রত্যাশিত আকস্মিকভাবে আসে এবং এক বাক্যে একটিবার মাত্র ব্যবহৃত হয়, তবেই তার মাধুর্য খোলে। উপরের উদাহরণগুলিতেই একথা প্রমাণিত হইয়াছে।

এই নিয়ম মানিয়া আধুনিক গদ্যেও সুকৌশলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; বিশেষতঃ হাস্যরস সৃষ্টিতে আধুনিক রচনায় ইহার উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। উদাহরণ—

(১) "যৌবনকে টীকা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, তাহাকে বসন্তের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।" —প্রমথ চৌধুরী

(২) "বিচ্ছেদ ঘটেছিল রাগের মাথায়—মিলন ঘটুক অনুরাগের ক্রোড়ে। অনুরাগ যে স্বভাবতঃই রাগের অনুসরণ করে, তার পরিচয় তো তার উপসর্গেই পাওয়া যায়।" —প্রমথ চৌধুরী

উপসর্গ—(১) প্র, পরা, অপ, অনু প্রভৃতি, (২) লক্ষণ বা রোগের লক্ষণ।

গদ্যে গম্ভীর বিষয়েও শ্লেষ, বিশেষতঃ অর্থ-শ্লেষের প্রয়োগ হয়; যথা—

(৩) "যে-রস অনেক কাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে।"—রবীন্দ্রনাথ

রস—(১) জল, (২) আনন্দ।

নিম্নস্তরে—(১) ভূমধ্যের নিম্নস্তরে, (২) সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীতে।

বাক্যগত শব্দ-শ্লেষ

বাক্যগত শব্দ-শ্লেষের এক প্রসিদ্ধ উদাহরণ অন্নপূর্ণার আত্মপরিচয়, যথা—

(১) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার, কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥" —ভারতচন্দ্র

এখানে শ্লেষ কেবল একটিমাত্র শব্দ-গত নয়, ইহা সমগ্র বাক্য-গত। আগা-গোড়া দুই অর্থ চলিয়াছে। এক অর্থ—কুলীনের ঘরের স্বামী ও সপত্নীর বর্ণনা, পাটনী এই অর্থই বুঝিয়াছে। অপর অর্থ—শিবের স্বরূপ বর্ণনা, সেই সূত্রে দেবীর স্বরূপ-পরিচয়। দ্বিবিধ অর্থ এই প্রকার:— অতি বড় বৃদ্ধ—খুব বুড়া; সর্বজ্যেষ্ঠ, অনাদি। সিদ্ধি—ভাঙ্; মুক্তি। কোন গুণ নাই—গুণহীন; নির্গুণ ব্রহ্ম। কপালে আগুন—পোড়া কপাল; ললাটে বহ্নি। কু—মন্দ; পৃথিবী। পঞ্চমুখ—অত্যন্ত বাচাল; পঞ্চ আনন। কণ্ঠ-ভরা বিষ—কটুভাষী; নীলকণ্ঠ। দ্বন্দ্ব—কলহ; মিলন। গঙ্গা—সতিনের নাম; ভাগীরথী। তরঙ্গ—কলহ-ঝঙ্কার; ঢেউ। জীবন—প্রাণ; জল। শিরোমণি—অতি আদৃতা; মস্তক-ভূষণ। ভূত—প্রাণিবর্গ; প্রমথগণ। না মরে—মর্‌লে আপদ যায়, কিন্তু মরে না; অমর। পাষাণ—কঠিন হৃদয়; প্রস্তর (হিমালয় পর্বত)।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে—'অতি বড় বৃদ্ধ','কপালে আগুন', 'কণ্ঠভরা বিষ', 'তরঙ্গ,' 'শিরোমণি,' 'না মরে', 'পাষাণ'—এই পদগুলি প্রকৃতপক্ষে শব্দ-শ্লেষ নয়, অর্থ-শ্লেষ। এই পদগুলির মূলতঃ একটিমাত্রই অর্থ, দুই ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে; সমার্থক অন্য শব্দ বসাইলেও চমৎকারিত্ব মোটামুটি থাকে। 'তরঙ্গ', 'শিরোমণি' বা 'পাষাণ'-এর পরিবর্তে 'ঢেউ', 'মস্তকভূষণ' বা 'পাথর' বসাইলে বিশেষ ক্ষতি নাই।

সমগ্র অলঙ্কারটি **বাক্যগত-শব্দ-শ্লেষ**।

প্রশ্ন—এখানে উভয় অর্থই বাচ্য বা প্রাসঙ্গিক কিনা? শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয় বলেন, এখানে মাত্র একটি অর্থ—যে অর্থ পাটনী বুঝিয়াছে, তাহাই প্রাসঙ্গিক। অতএব এখানে শ্লেষ থাকিলেও শ্লেষালঙ্কার নাই, অলঙ্কার ব্যাজস্তুতি। ইহা ব্যাজস্তুতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্লেষ অলঙ্কারকেই

১। অলঙ্কার-নির্ণয়, পৃষ্ঠা ১১।

বা অস্বীকার করিব কেন ? দুইটি অর্থ ই যে বক্তার অভিপ্রেত। প্রথম অর্থটি পাটনীকে ধোঁকা দিবার জন্য ছল-পরিচয়, দ্বিতীয় অর্থটি সত্য বা স্বরূপ পরিচয়, পাটনী পণ্ডিত হইলে সেই অর্থ ই বুঝিত, অন্ততঃ দেবীকে চিনিবার পর সেই অর্থ পরিষ্কার হইত। তাহা হয় নাই। ইহাতে পাটনী-চরিত্রের স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, শ্লেষালঙ্কারও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

(২) "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ?"—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

একই বাক্যে ভগবানের ও কবির নিজের মহিমা প্রকাশ করা হইয়াছে। উভয় অর্থ ই তাই বাচ্য।

এখানে ঈশ্বর—ভগবান্; কবির নাম। প্রভাকর—সূর্য; ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকার নাম। এই দুইটি শব্দ-শ্লেষ। কিন্তু, গুপ্ত—লুক্কায়িত, অজ্ঞাত; ব্যাপ্ত—সর্বত্রস্থিত, অতিশয় খ্যাত; প্রভা—জ্যোতি, প্রতিভা;—এই তিনটি অর্থশ্লেষ।

সমগ্র বাক্যটিকে বাক্য-গত শব্দ-শ্লেষের উদাহরণ বলিতে হইবে।

বাক্যগত শব্দ-শ্লেষের অসাধারণ ঘটা সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য-কাব্যে দেখা যায়। কাদম্বরীর অনুবাদ হইতে একটি উদাহরণ লওয়া হইতেছে। শূদ্রকের ও তাঁহার রাজ্যের বর্ণনা,—

(৩) "শূদ্রকের রাজত্বে প্রজাদের মধ্যে চিত্রকর্মেই ছিল বর্ণ-সঙ্কর...... শশী, কৃপাণ ও কবচেই কলঙ্ক......। তিনি কুটিলতা ভালবাসতেন—অন্তঃপুরিকাদের কুন্তলভঙ্গে, মুখরতা সহ্য করতেন—নূপুরে, অশ্রুবর্ষণ করতেন—যজ্ঞধূমে, এবং কশাঘাত করতেন—তুরঙ্গপৃষ্ঠে।"—প্রবোধেন্দু ঠাকুরকৃত কাদম্বরী

বর্ণ-সঙ্কর—রং এর মিশ্রণ; বিভিন্ন জাতির স্ত্রী-পুরুষের মিলন। কলঙ্ক—মালিন্য ও মরিচা; অপবাদ, দুর্নাম। কুটিলতা—বক্রতা; খল-স্বভাব। মুখরতা—শব্দায়মানতা। বাচালতা; অশ্রুবর্ষণ—চোখের জল ফেলা; কান্না।

দুইটি অর্থ ই বাচ্য। অর্থ এই প্রকার—রাজ্যে চিত্রশিল্পিগণ বিচিত্র চিত্র আঁকিবার জন্য নানারকম রং মিশাইতেন, কিন্তু নাগরিকগণ কেহ চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া ভিন্নবর্ণের নারী স্পর্শ করিতেন না। শূদ্রকের রাজ্যে চাঁদে কলঙ্ক ছিল, শত্রু না থাকায় যুদ্ধ করিতে হইত না বলিয়া অসি ও বর্মে মরিচা ধরিয়াছিল, কাহারও চরিত্রে কোন কলঙ্ক অপবাদ ছিল না।—ইত্যাদি।

সভঙ্গ শ্লেষ

সংস্কৃতে শব্দ-শ্লেষকে মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়,—অভঙ্গ ও সভঙ্গ। না ভাঙ্গিয়া যদি গোটা শব্দেরই দুই প্রকার অর্থ হয়, তবে সেখানে অভঙ্গ শ্লেষ। পূর্বে প্রদত্ত সমস্ত উদাহরণই অভঙ্গ শ্লেষের। মূল শব্দকে ভাঙ্গিয়া দুই অর্থ পাওয়া গেলে সভঙ্গ শ্লেষ। বাঙ্গালায় উহা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না, কারণ, বাঙ্গালায় সংস্কৃতের ন্যায় রচনার গাঢ়বন্ধ এবং উচ্চারণের ঘনসংহতি নাই। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দুই একটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে :—

(১) "পৃথিবী টাকার বশ।"

প্রথম অর্থ স্পষ্ট। 'টাকার' শব্দকে ভাঙ্গিয়া 'টা' ও 'কার' এই দুই ভাগে রাখিলে বাক্য হয়—'পৃথিবীটা কার বশ?' প্রশ্ন ও উত্তর এক সঙ্গে পাওয়া যাইতেছে। এখানে সভঙ্গ শ্লেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে হেঁয়ালি বলিয়া ধরা হয়।

(২) "অপরূপ রূপ কেশবে।

দেখরে তোরা এমন ধারা কালোরূপ কি আছে ভবে॥"—দাশরথি রায়

কৃষ্ণ-পক্ষে অর্থ স্পষ্ট। এখানে 'কেশবে' শব্দকে ভাঙ্গিয়া 'কে শবে' লিখিলে অর্থ হইবে,—শবে অর্থাৎ শবাকার শিবের উপরে কে? না, কালী। কালী-পক্ষে অর্থ এখন স্পষ্ট। এই শ্লেষশ্রিত রচনার দ্বারা শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নিরসন করিয়া কৃষ্ণ-কালীর অভেদ প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য।

লক্ষ্য করিবার এই যে, দুইটি উদাহরণেই একটি অর্থ অভঙ্গ শব্দের, অপরটি সভঙ্গ শব্দের।

(৩) "অর্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।

পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি॥"—ভারতচন্দ্র

যুব-জানি সমাসবদ্ধ পদ হইলে অর্থ হইবে যুবতী জায়া যাহাদের। উহাকে ভাঙ্গিয়া 'যুব জানি' লিখিলে অর্থ হইবে—সকলকেই যুবা বলিয়া জানি।

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় সভঙ্গ শ্লেষ হইতে পারে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে,—ইহাও ইংরাজীর Pun বা Paronomasia।

(৫)

বক্রোক্তি

রচনার সৌন্দর্য-প্রকাশের উদ্দেশ্যে বক্রতা বা মনোহর ভঙ্গীর দ্বারা উক্তি সম্পন্ন হইলে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।

দুই বিশিষ্ট ভঙ্গীর আশ্রয়ে এই বক্রোক্তি অলঙ্কার সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য উহা দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়, যথা—শ্লেষ-বক্রোক্তি ও কাকু-বক্রোক্তি।

দণ্ডী যে বক্রোক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা কোন বিশিষ্ট অলঙ্কার নহে; তাহার মধ্যে স্বভাবোক্তি ছাড়া সমুদয় অর্থালঙ্কারই পরিগণিত হয়, তাহা যে-কোন প্রকার ভঙ্গী-বৈচিত্র্যপূর্ণ উক্তি।

শ্লেষ-বক্রোক্তি

শ্লেষাশ্রিত বক্রোক্তিই শ্লেষ-বক্রোক্তি। কোন শব্দ বক্তা যে অর্থে প্রয়োগ করেন, প্রতিবক্তা যদি তাহা অন্য অর্থে গ্রহণ করেন, তবে এই অলঙ্কার হয়।

এই অলঙ্কারে তাই বক্তা ও প্রতিবক্তা দুই জনের প্রয়োজন, এবং দুই অর্থের প্রাসঙ্গিকতা বা বাচ্যত্ব দুই দিক্ হইতে সমর্থনীয়।

শ্লেষালঙ্কারে উভয় অর্থই এক বক্তার অভিপ্রেত, তাহাতে উত্তর প্রত্যুত্তর থাকিতে পারে না। উদাহরণ—

(১) "সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসব কোন্ দুঃখে।"

—রবীন্দ্রনাথ (শ্রাবণ-গাথা)

অর্থ শব্দের বক্তার অভিপ্রেত অর্থ—অভিধেয়, তাৎপর্য; প্রতিবক্তার অভিপ্রেত অর্থ—টাকাকড়ি।

(২) "রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। এ কি চীনা অক্ষরে লেখা নাকি?

নটরাজ। বলতে পারেন অচিনা অক্ষরে।"

—রবীন্দ্রনাথ—(শ্রাবণ-গাথা)

উচ্চারণে 'চীনা' ও 'চিনা' একই প্রকার। চীনা অক্ষর—চীন দেশের লিপি। অচিনা অক্ষর—যে অক্ষর চিনি না।

(৩) প্রাচীনকালের উদাহরণ—

প্রশ্ন—'দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন?'
উত্তর—'রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।'
প্রশ্ন—'বলি এত সুরাসক্ত কেন মহাশয়?'
উত্তর—'সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয়!'
প্রশ্ন—'মধুর সঙ্গমে কেন এমন আদর?'
উত্তর—'বসন্তকে হেয় করে সে কোন্ পামর!' —হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

দ্বিজরাজ—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; চন্দ্র। বারুণী—মদ্য; পশ্চিমদিক। সুরাসক্ত—সুরায় বা মদে আসক্ত; সুর বা দেবতায় ভক্তি-যুক্ত। মধুর—মদ্যের; বসন্তকালের।

কাকুবক্রোক্তি

প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতের কাকু-বক্রোক্তি বাঙ্গালায় নাই। সংস্কৃতে অর্ধচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোন বিরাম-চিহ্ন ছিল না, প্রশ্নবোধক কোন চিহ্নও ছিল না। তাই কেবল এক দাঁড়ি বা দুই দাঁড়ি থাকিলে বাক্যটি প্রশ্নবোধক, কি আর কিছু বুঝিতে হইত কেবল কাকু অর্থাৎ বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গী-দ্বারা। এই জন্য কাকুর পরিবর্তনে নিষেধ বিধিতে এবং বিধি নিষেধে পর্যবসিত হইত। বাঙ্গালায় সর্বপ্রকার বিরামচিহ্নের ব্যাপক ব্যবহার-হেতু সেই কাকু-বক্রোক্তি আর নাই।

তবে ইংরাজীর Interrogation বা Erotesis অলঙ্কারটি এই কাকু-বক্রোক্তি দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে উহার সংজ্ঞা হইবে,— যে উক্তিতে-প্রশ্ন-বোধক কাকু বা কণ্ঠস্বর দ্বারা বক্তার অভিপ্রেত অর্থের দৃঢ় স্থাপনা হয়, অথবা, পরম বিস্ময় প্রকাশিত হয়, তাহার নাম **কাকুবক্রোক্তি**।

ইহার সৌন্দর্য স্পষ্ট, তাই এই উক্তিও বক্রোক্তি। উদাহরণ—দৃঢ়-স্থাপনা—

(১) "কি কহিলি বাসন্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?

দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃকুলবধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?" —মধুসূদন দত্ত

প্রমীলার উক্তি। এখানে প্রথম প্রশ্ন সাধারণ, কোন বৈচিত্র্য নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া প্রমীলার অভিপ্রেত অর্থ অনেক দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

(২) "গান্ধারী। মাতা আমি নহি ? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ?" —রবীন্দ্রনাথ

(৩) "সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, একথা অগ্রাহ্য। উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না ? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না ?"—তারাশঙ্করকৃত কাদম্বরী

স-বিস্ময় আনন্দ প্রকাশ—

(৪) "এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ,—"এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে
নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?" —মধুসূদন দত্ত

লক্ষ্মণকে সম্মুখে দেখিয়া উত্তেজিত রাবণের উক্তি—অসম্ভব যেন সম্ভব হইয়াছে, চক্ষুকে যেন বিশ্বাস হয় না। যে লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মত্তের ন্যায় খুঁজিতেছেন, সেই কি সম্মুখে ? এই প্রশ্ন-বোধক বাক্যে বিপুল বিস্ময় ও আনন্দ বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় বাক্যটি সাধারণ প্রশ্নবোধক।

(৫) "যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ)
প্রাণের গোপাল আমার,
এত দিনে এলি কি ঘরে ?
মনে কি তোর আছে বাছা,
এ দুঃখিনী জননীরে ?" —কৃষ্ণকমল গোস্বামী

এখানে প্রথম বাক্যে স-বিস্ময় আনন্দ, দ্বিতীয় বাক্যে দৃঢ়-স্থাপনা।

এই অলঙ্কারটি সম্বন্ধে Walker মন্তব্য করিয়াছেন,—"the most powerful engine in the whole arsenal of oratory."

১। ইংরাজী সাহিত্যের এক অনুরূপ উক্তি—

And is this the Yarrow ? This stream
Of which my fancy cherished
So faithfully, a waking dream ?"— *Wordsworth*

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থালঙ্কার

শব্দের ধ্বনি নয়, কেবল অর্থের আশ্রয়ে যে সকল সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে বলে অর্থালঙ্কার।

অর্থালঙ্কারে তাই অর্থের বাহন শব্দের সমার্থক শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা যায়; সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপেই অর্থ-গত বলিয়া তাহাতে অলঙ্কারের বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। 'চাঁদের মত সুন্দর মুখখানি' বলি, অথবা, 'সুধাংশুর ন্যায় মনোহর মুখখানি', অথবা 'শশীর তুল্য চারু বদনখানি' বলি অর্থ-গত সৌন্দর্য প্রায় একই প্রকার থাকে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই একই উপমা অলঙ্কার।

বর্ণনীয় বস্তুর সাদৃশ্য-সূত্রে অনুরূপ অন্য বস্তু আক্ষিপ্ত হইতে পারে বলিয়া অর্থালঙ্কারে সহজেই প্রকাশ পায় কাব্যের চিত্র-ধর্ম।

অর্থালঙ্কারসমূহের মধ্যে স্বতন্ত্র মহিমা রহিয়াছে বলিয়া এবং সকল অর্থালঙ্কারের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে বর্তমান বলিয়া সর্বাগ্রে আলোচিত হইতেছে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অর্থালঙ্কারসমূহের মুখ্য ভেদ দুই প্রকার,—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি।

(১)

স্বভাবোক্তি

পদার্থ-সমূহের স্বভাব-বিষয়ক উক্তি বা বর্ণনা দ্বারা যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম স্বভাবোক্তি অলঙ্কার।

দণ্ডী ইহাকেই আদ্য অলঙ্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানে পদার্থ বলিতে নিসর্গ, মানুষ বা যে কোন প্রকার প্রাণী, জাতি-গুণ--ক্রিয়া-দ্রব্যময় সৃষ্টির যে কোন প্রকার বস্তুকেই বুঝায়। স্বভাব বলিতে বুঝায় বস্তুর সেই অ-সাধারণ ধর্ম বা নিজস্ব মহিমা, যাহাতে সে বা তাহা সৃষ্টির মধ্যে

অতুলনীয়, অর্থাৎ বস্তুর বিশিষ্ট আকৃতি, গতি, বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপ, ও সূক্ষ্ম ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতি। উক্তি হইতেছে সাক্ষাৎ বিবরণ, যাহাতে চিত্তে ছবির রস সঞ্চারিত হয়। স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে বস্তুর অবলম্বনে কবিচিত্ত বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ না হইয়া, কবিচিত্তের অবলম্বনে বস্তুই স্বমহিমায় দ্যোতমান হয় ইহাই কাব্যের প্রাণ-ভূত সৌন্দর্য।

এই স্বভাববর্ণন-সম্পর্কে লী হাণ্টের একটি উক্তি বড় চমৎকার। তিনি বলিতেছেন,—

"শুধু তাই নয়, সহজতম সত্যটি অনেক সময়ে এত সুন্দর এবং নিজেই এত হৃদয়গ্রাহী যে, কবির প্রতিভার সর্বাপেক্ষা একটি বড় প্রমাণ হইতেছে, ইহাকে কেবল স্বভাবে থাকিতে দেওয়ায়; ইহা শুধু নিজ অশ্রু বা হাসির প্রভা, নিজ বিস্ময়, শক্তি এবং লীলাময়ত্বে নিজেই প্রকাশ পাইবে, আর কিছুতে নহে।"[১]

ই. ডি. সেলিনকোর্টও মন্তব্য করিয়াছেন,—

"পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতায় উপমাও নাই, রূপকও নাই। অথচ তাহারা সেই আশ্চর্য মায়া দ্বারা হৃদয়কে বিদ্ধ করে, যাহা স্বভাবের নিরতিশয় সরলতায় বর্তমান।"[২]

অবশ্য উপমা যদি স্বভাবের সরলতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া পুষ্ট করে, তবে তাহাতে স্বভাবোক্তির গৌরব-হানি হয় না।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কার নিসর্গ-বর্ণনায় দেখা যায় এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণি-সম্বন্ধীয় বর্ণনায় দেখা যায়। 'নিসর্গ' শব্দ সংস্কৃতে সর্গ বা সমগ্র সৃষ্টি বুঝাইলেও বাঙ্গালায় মূক দৃশ্যমান প্রকৃতি অর্থাৎ Nature অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই নিসর্গ বা Nature আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের এক প্রধান অবলম্বন।

১। "Nay, the simplest truth is often so beautiful and impressive of itself, that one of the greatest proofs of his genius consists in his leaving it to stand along, illustrated by noting but the light of its own tears and smiles, its own wonder, might or playfulness." —*What is Poetry?*

২। "But some of the greatest poetry is bare of either simile or metaphor, piercing the heart by that strange spell that lies in utter simplicity."

স্বভাবোক্তির সর্বপ্রকার উদাহরণ, এমন কি তাহার সূক্ষ্ম কারুকার্য অথবা কল্পনা-বিলাসের প্রত্যক্ষ রূপও রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যে 'বসুন্ধরা' কবিতায় পাওয়া যায়, যথা—

নিসর্গ-বর্ণনা—কবিতার প্রারম্ভে মরুভূমির বর্ণনা, শৈলমালার বর্ণনা, মহামেরুদেশের বর্ণনা, সমুদ্রতটবর্তী একখানি গ্রামের বর্ণনা ইত্যাদি।

একটি মাত্র বর্ণনা লওয়া হইতেছে,—

(১) মহামেরুদেশ—

"মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে—যেখানে ল'য়েছে ধরা
অনন্ত কুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন ;
যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন ! রাত্রি আসে
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো !"

বর্ণনা চমৎকার। মেরুদেশের রহস্যময় সৌন্দর্য নিঃশেষে কবি-কল্পনায় ধরা দিয়াছে। এখানেও সাধর্ম্যসূত্রে কুমারীব্রতের উল্লেখ মেরু-প্রদেশের চিন্ময় মূর্তিটিকে প্রকট করিয়া দিয়াছে। এখানে সূক্ষ্ম কবিকর্মের চাইতেও লক্ষ্য করিবার হইল কল্পনাবিলাসের প্রত্যক্ষ রূপ।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকাব্যের 'সুখ' কবিতাটির প্রথমার্ধ স্বভাবোক্তির আর একটি সুন্দর উদাহরণ। উপমাগুলি সেখানে বাহিরে ও অন্তরে এক অপূর্ব ছবির রস সঞ্চার করিয়া চিত্তের গভীরতর দেশে জীবনানন্দের সহজ স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে ক্লাইভের সৈন্যের সহিত নবাব-সৈন্যের যুদ্ধ-বর্ণনা স্বভাবোক্তি-অলঙ্কারের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য হইতে যথাক্রমে একটি সরল ও একটি জটিল উদাহরণ লওয়া হইতেছে,—

(২) "আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে।
স্তোককৃষ্ণ অংশুমান দাম বসুদাম সাথে ॥
কটি কাছনি বঙ্কিম ধটি বেণুবর বাম কাঁখে।
জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে ॥
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কাণে কুণ্ডলখেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ তাড় বালা ॥
স্ফুট চম্পকদল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনুশোভা।
পদপঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর মনোলোভা ॥"

গোচারণের বেশ-পরিহিত গোপবালকদের বর্ণনা। সহজ সরল কিন্তু সুন্দর স্বভাবোক্তি।

(৩) "দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে ;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;
মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;"

—জীবনানন্দ দাশ ('মৃত্যুর আগে')

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটিকে বলিয়াছেন 'চিত্ররূপময়'। এই চিত্রগুলি কেবল দৃশ্যের নয়, বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের।

এই স্তবক দুইটি বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া শ্রীবুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করিয়াছেন,—

দৃষ্টি, স্পর্শ ও গন্ধের বিচিত্র ভোজ ব'সে গেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও শেষ পংক্তির অপ্রকট সলজ্জ সহজ অনুপ্রাস লক্ষ্য করুন, গাঢ় রাতে

জ্যোছনার উঠোনে খড়ের চালের স্পষ্ট কালো ছায়ার সামনে চুপ করে দাঁড়ান—অনুভব করুন ঘুমের ঘ্রাণ, ঝিঁঝির গন্ধ, নরম জলের গন্ধ, চালের ধূসর গন্ধ, তরঙ্গের রূপ, প্রান্তরের সবুজ বাতাস। কোনো শব্দের উল্লেখ নেই—প্রকৃতি এখানে শান্ত, সান্ধ্য, স্বপ্নাচ্ছন্ন, শব্দহীন।" —কালের পুতুল

(২)

বক্রোক্তি

সম্বন্ধ-মূল অলঙ্কার

লক্ষ্যোক্তি

লক্ষণা-শক্তির প্রয়োগে উক্তিতে যে বিশিষ্ট সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়, তাহার নাম লক্ষ্যোক্তি অলঙ্কার।

লক্ষণা একটি শব্দশক্তি, তাহা অলঙ্কার নহে; তাহার প্রয়োগে লক্ষ্যার্থে অলঙ্কার বা সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

আলঙ্কারিকগণের মতে শব্দের তিনটি বৃত্তি বা শক্তি থাকিতে পারে,—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। যে শক্তিদ্বারা শব্দ সাক্ষাৎ ভাবে সঙ্কেতিত অর্থকে বুঝায়, তাহার নাম **অভিধা-শক্তি**। অভিধাই শব্দের মুখ্যশক্তি, ইহা সকল শব্দেই বর্তমান। অভিধা-শক্তিদ্বারা লব্ধ অর্থই শব্দের প্রকৃত অর্থ, অভিধানে যাহা পাওয়া যায়, তাহার নাম অভিধেয় অর্থ, বা বাচ্যার্থ; যেমন—নর অর্থ মনুষ্য, গগন অর্থ আকাশ ইত্যাদি।

বাক্যে অভিধা-শক্তির প্রয়োগে মুখ্যার্থের উপলব্ধিতে বাধা জন্মিলে, যে শক্তিবলে বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট প্রকৃত অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম **লক্ষণা-শক্তি**। লক্ষণা-শক্তিদ্বারা প্রতীত অর্থকে বলে লক্ষ্যার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ। লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনাও মুখ্যতঃ শব্দের শক্তি নহে, ইহা বাক্যেরই শক্তি, শব্দবিশেষকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় মাত্র।

লক্ষণা দুই প্রকার,—রূঢ়ি-লক্ষণা ও প্রয়োজন-লক্ষণা। রূঢ়ি অর্থ প্রসিদ্ধি অর্থাৎ লোকব্যবহার-গত প্রসিদ্ধি।

প্রাচীন উদাহরণ—কলিঙ্গ সাহসিক।

এখানে 'কলিঙ্গ' অর্থ ঐ নামের দেশবিশেষ হইতে পারে না; কারণ মৃন্ময় এক অচেতন ভূখণ্ড সাহসিক বা অসাহসিক এইরূপ কোন কথা উঠিতে পারে

না। মুখ্যার্থের বাধা হওয়ায় এখানে অর্থ হইবে 'কলিঙ্গ দেশবাসী', ইহা মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এই লক্ষণাদ্বারা বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, ইহা লোকব্যবহার-গত প্রসিদ্ধি মাত্র। তবে ইহাতে বাক্য-সংক্ষেপ হওয়ায় কিছু সৌন্দর্য বাড়ে।

প্রয়োজন-লক্ষণার আশ্রয়েই লক্ষ্যোক্তি অলঙ্কারের সার্থকতা। ইহাদ্বারা নূতন অর্থের দ্যোতনা হয়; অর্থের গুরুত্ব, সুস্পষ্টতা বা আশুবোধগম্যতা আসে; রচনার ঘনতা ও সংক্ষিপ্ততা ঘটে।

প্রাচীন উদাহরণ—

(১) গঙ্গায় ঘোষেরা (গোয়ালেরা) বাস করে ।

(২) কুন্তগুলি (বল্লমগুলি) প্রবেশ করিল ।

প্রথম বাক্যে গঙ্গাশব্দ গঙ্গাতীর বুঝাইতেছে; কেননা গঙ্গায় অর্থাৎ গঙ্গাজলে কোন মনুষ্য বাস করিতে পারে না। মুখ্যার্থের বাধা হওয়ায় তদ্-যুক্ত গঙ্গাতীর অর্থ বুঝাইতেছে। এখানে লক্ষণার প্রয়োজন—গঙ্গানদীর শীতত্ব, পাবনত্ব প্রভৃতি বিশেষ করিয়া বুঝান। বাগ্‌ভঙ্গীদ্বারা স্বল্পকথার অনেক অর্থের দ্যোতনা হইল। 'গঙ্গায়' না বলিয়া 'গঙ্গাতীরে' বলিলে অভিপ্রেত অর্থ এইরূপ পরিস্ফুট হইত না।

এইরূপ দ্বিতীয় বাক্যে 'কুন্তগুলি' অর্থ 'কুন্তধারী সৈন্যদল'। লক্ষণার প্রয়োজন—কুন্তগুলির 'অতিগহনত্ব' এবং উদ্যত ও আক্রমণাত্মক ভাব বিশেষ করিয়া বুঝান।

প্রাচীন-গণের মতে লক্ষণার প্রয়োজন হইতেছে একটি নূতন অর্থের দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা। রূঢ়ি-লক্ষণায় কোন নূতন অর্থের ব্যঞ্জনা নাই। এই জন্য রূঢ়ি-লক্ষণা ব্যঙ্গ্যার্থ-রহিতা, প্রয়োজন-লক্ষণা ব্যঙ্গ্যার্থ-সহিতা।

আমাদের মনে হয় প্রয়োজন-লক্ষণা সকল ক্ষেত্রেই স্পষ্টরূপে কোন নূতন অর্থের দ্যোতনা করে না। তাহা অনেক সময়ে বাক্যার্থের সুস্পষ্টতা বা আশু বোধগম্যতা ঘটায়, তাহাকে সুমূর্ত (Concrete) করে এবং তাহাতে গুরুত্ব সঞ্চার করে। এই প্রয়োজনও তুচ্ছ করিবার নহে। সাহিত্য-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যই অভিপ্রেত অর্থকে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত করা। রচনার প্রসাদ গুণ এই উদ্দেশ্যের কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করে, এই জন্য আরও অনেক কলা-কৌশল অবলম্বিত হয়। এই প্রসঙ্গে কুইন্টিলিয়ানের সুন্দর মন্তব্যটি

উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, "লেখকের প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে সেই ভাষা, যাহা কেবল বুঝা যাইবে তাহা নহে, যাহা না বুঝিয়া পারা যাইবে না।"[১] রচনাভঙ্গী এমন হইবে যাহাতে অবান্তর বিষয় বা খোসা ফেলিয়া আসল বস্তুর প্রতি পাঠকের মন তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয় এবং যথাসম্ভব অল্পায়াসেই তাহা আয়ত্ত করা যায়।

লক্ষণার সুস্পষ্টতার উদাহরণ—

(১) নদীবক্ষে দশখানি পাল যেন উড়িয়া চলিল।
(২) পক্ককেশের সম্মান করিবে।
(৩) ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত।

প্রথম বাক্যে 'পাল' অর্থ পাল-তোলা নৌকা।

এখানে লেখকের নিকট প্রসঙ্গ-বলে যাহা সব চাইতে অর্থ-পূর্ণ, বস্তুটির যে অংশ তাহার স্পষ্ট পরিচায়ক এবং আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর, তাহারই উল্লেখ করায় বর্ণনীয় সমগ্র বিষয়টি ছবির মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখানেও অবশ্য 'কুন্তগুলি প্রবেশ করিল'—এই বাক্যের ন্যায় একটি ব্যঙ্গার্থ রহিয়াছে। কিন্তু তাহার চাইতে সুস্পষ্টতা বা সুমূর্ততাই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার।

কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে কেবলই সুস্পষ্টতা, বার্ধক্যের বা বয়-আধিক্যের স্পষ্টরূপ পক্ককেশ।

তৃতীয় বাক্যে 'ভাত' অর্থ মোটা খাদ্য দ্রব্য, 'কোঁচা তিন হাত' অর্থ পোষাকের পারিপাট্য। এখানে সামান্য-স্থলে বিশেষের প্রয়োগ হইয়াছে। বিশেষের প্রয়োগদ্বারা বিষয়টিকে সুমূর্ত করিয়া ইন্দ্রিয়-গোচর ও বুদ্ধি-গোচর করা হইয়াছে।

লক্ষ্যোক্তির দুইটি মূলভাগের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ দেখাইয়া উদাহরণ-মালা দেওয়া হইতেছে।

১। "Not language that may be understood, but language that cannot fail to be understood, is the writer's true aim."

রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধি-মূলক

ইহাতে বাক্য-সংক্ষেপ-জনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়।

[এক] অধিবাসী বা অধিপতি-স্থলে দেশ বা ভূখণ্ড—

(ক) অধিবাসী বুঝাইতে—

(১) "ভাসিছে কনকলঙ্কা আনন্দের নীরে।" —মধুসূদন

লঙ্কা—লঙ্কার অধিবাসী।

(২) 'পঞ্জাব আজি গরজি' উঠিল—অলখ নিরঞ্জন ॥"—রবীন্দ্রনাথ

পঞ্জাব—পঞ্জাবের অধিবাসী।

(৩) 'জাপানের সহিত মিত্রতা', 'রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ' ইত্যাদি।

জাপান—জাপানের অধিবাসী, রুশিয়া—রুশিয়ার অধিবাসী।

(৪) "গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।"—সত্যেন্দ্র দত্ত (চরকার গান)

গঙ্গায়—পশ্চিমবঙ্গে, মেঘনায়—পূর্ববঙ্গে, তিস্তায়—উত্তর বঙ্গে, বঙ্গে—বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে।

(খ) অধিপতি বুঝাইতে—

(১) "গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।"

—রামপ্রসাদ সেন

গিরি—গিরির অধিপতি।

(২) 'হায়দরাবাদের অভিপ্রায়'—হায়দরাবাদের অধিপতি নিজামের অভিপ্রায়।

(৩) 'বরোদার বদান্যতা'—বরোদার অধিপতি গায়কোয়াড়ের বদান্যতা।

[দুই] প্রতিনিধিবর্গ-স্থলে দেশ বা প্রতিষ্ঠান—

(১) 'ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে।'

ইংলণ্ড—ইংলণ্ডের প্রতিনিধি-স্থানীয় খেলোয়াড়গণ।

অষ্ট্রেলিয়া—উহার প্রতিনিধি-স্থানীয় খেলোয়াড়গণ।

(২) 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছে।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—উহার প্রেরিত প্রতিনিধিগণ।

প্রয়োজন-মূলক

প্রয়োজন দ্বিবিধ হইতে পারে,—স্পষ্ট একটি ব্যঞ্জনার প্রয়োজন, সুস্পষ্টতা ও সুমূর্ততার প্রয়োজন।

[এক] বস্তু-স্থলে প্রতীক—

(১) "মহারাজ, এ সংবাদে
ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন
যতেক চিক্কণ মাথা ; অমঙ্গল স্মরি
রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত"—রবীন্দ্রনাথ (রাজা ও রাণী)

টিকি—ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক। এখানে মূলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যহীন বেশসর্বস্ব মিথ্যাচারের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে।

(২) "বাম হাতে যার কমলার ফুল ডাহিনে মধুকমালা"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (আমরা)

কমলার ফুল—শ্রীহট্টের প্রতীক। মধুকমালা—মহুয়া ফুলের মালা, সাঁওতাল পরগণার প্রতীক। এখানে প্রতীকের ধর্মে অপরূপ সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা হইয়াছে।

(৩) "লাল টুপি আর কালো কোর্তা জুজুর ভয় কি আর চলে !"

--কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

লাল টুপি আর কালো কোর্তা—পুলিশের প্রতীক। এখানে স্পষ্টার্থতাই বেশী।

(৪) "গেরুয়ার সম্মান এখনও দেখা যায়।"

গেরুয়া—সন্ন্যাসীর প্রতীক। এখানে গুণ-নিরপেক্ষ বেশের প্রতি অন্ধ ভক্তির ব্যঞ্জনা রহিয়াছে।

[দুই] আধেয় স্থলে আধার—

(১) "ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি" —রবীন্দ্রনাথ

তরী—তরীর মাঝি-মাল্লা।

(২) "বোতলেই তাহার সর্বনাশ করিল।"

বোতলেই—মদেই।

(৩) "ভাতের হাঁড়ি টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।"

ভাতের হাঁড়ি—হাঁড়ির ভাত।

[তিন] সৃষ্টবস্তু-স্থলে স্রষ্টা—যেমন গ্রন্থ-স্থলে গ্রন্থকার—

(১) "সেক্ষপীয়র বড় বেশী পড়িতাম।" —বঙ্কিমচন্দ্র

সেক্ষপীয়র—সেক্ষপীয়রের রচিত নাট্যাবলী।

(২) "পাণিনি আয়ত্ত করিয়াছ কি ?"

পাণিনি—পাণিনি-রচিত ব্যাকরণ।

[চার] কারণ-স্থলে কার্য—

(১) "নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি" —রবীন্দ্রনাথ (দুঃসময়)

মরণ—এখানে সমুদ্র, উহাই মরণের কারণ।

(২) "পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্য অরোরার।"—সত্যেন্দ্রনাথ

[পাঁচ] কার্য-স্থলে কারণ—

(১) "যত পায় বেত, না পায় বেতন তবু না শাসন মানে।"

—রবীন্দ্রনাথ (পুরাতন ভৃত্য)

বেত—বেতের আঘাত।

[ছয়] কারণ ও কার্যের অভেদ—

(১) 'ঘৃতই আয়ু।'

ঘৃত কারণ, আয়ু কার্য, উভয়ের অভেদ করা হইয়াছে। এখানে লক্ষণার প্রয়োজন হইতেছে,—ঘৃতই সকল খাদ্যবস্তু অপেক্ষা অধিক আয়ুষ্কর এবং অব্যর্থভাবে আয়ুষ্কর, ইহা বুঝান।

(২) "চরকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র।" —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চরকা—কারণ, বস্ত্র—কার্য। উভয়ের অভেদ করা হইয়াছে।

(৩) "বীরশোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার" —নবীনচন্দ্র সেন

'বীরশোক' কারণ, 'অশ্রু' বা 'অসির ঝঙ্কার' কার্য। উভয়ের অভেদ করা হইয়াছে।

[সাত] সমগ্র-স্থলে অংশ বা অংশ-স্থলে সমগ্র—

(১) "চতুর্দশ বসন্তের এক গাছি মালা," —রবীন্দ্রনাথ

বসন্ত—বসন্ত ঋতু, এখানে বৎসর বুঝাইতেছে। লক্ষণার প্রয়োগে এখানে পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা হইয়াছে।

(২) "এক শ' শরৎ বাঁচব মোরা সুস্থ সবল বুক!"

শরৎ—শরৎ ঋতু, এখানে বৎসর।

(স্কু) 'আপনা হাত জগন্নাথ।'

আপনা হাত—আত্মশক্তি, পৌরুষ।

অংশ-স্থলে সমগ্রের ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

[আট] সামান্য-স্থলে বিশেষ বা বিশেষ-স্থলে সামান্য—

(১) "হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা" —রবীন্দ্রনাথ

হীরামুক্তামাণিক্য—সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য।

(২) "বিনা উপকারে খায় ধুতি।" —মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

ধুতি—বিবিধ ঘুষ। এইরূপ 'পান খাবার টাকা।'

(৩) "ঢেঁকশালে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই?"

ঢেঁকশাল—সাধারণ স্থান, মাণিক—দুর্লভ বস্তু, পর্বত—দুর্গম দেশ।

বিশেষ-স্থলে সামান্যের ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

[নয়] গুণ-স্থলে বস্তু—

(৪) "শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?" —রবীন্দ্রনাথ

শিকল—পরাধীনতা-স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২) "বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে;"
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বাঘ—হিংস্র প্রকৃতি, নাগ—ধ্বংসকর ধর্ম।

[দশ] বস্তু-স্থলে গুণ—

(১) "অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।" —রবীন্দ্রনাথ

অত্যাচার—অত্যাচারী।

(২) "নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠ রুদ্ধ করি'।" —রবীন্দ্রনাথ

নিন্দা—নিন্দুক।

(৩) "কোন্ নিরুদ্দেশের পানে" —রবীন্দ্রনাথ

নিরুদ্দেশ—নিরুদ্দিষ্ট স্থান।

(৪) "উঠিয়াছি চিরবিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !" —নজরুল ইসলাম
বিস্ময়—বিস্ময়ের স্থল।

সূক্ষ্ম-বিচারে আরও অনেক বিভাগ করা যাইতে পারে, যেমন, কর্তার স্থলে কার্য-সাধনোপায় (যথা—'অসির চাইতে মসী বড়') ইত্যাদি। বস্তুতঃ আলোচিত বিষয়গুলির বাহিরেও অনেক প্রকার লক্ষণার উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

ইংরাজী Metonymy এবং Synecdoche সাধারণতঃ এই লক্ষ্যোক্তির অন্তর্গত, সর্বক্ষেত্রে নহে। লক্ষণাশক্তির প্রয়োগে মুখ্যার্থের বাধা হওয়া অত্যাবশ্যক। এই জন্য 'He ascended the throne'—তিনি সিংহাসন অরোহণ করিলেন—এই বাক্য ইংরাজী মতে Metonymy হইলেও আমাদের বিচারে লক্ষ্যোক্তি নহে, কারণ, এখানে মুখ্যার্থের বাধা হইয়াছে বলা যায় না।

(৩)

আরোপোক্তি বা উপচরিত বিশেষণ

লক্ষণাশক্তি দ্বারা একপদের বিশেষণ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত অন্য পদে আরোপিত বা উপচরিত হইয়া যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, তাহার নাম আরোপোক্তি অলঙ্কার।

ইহাকে উপচরিত বিশেষণ বা আরোপিত বিশেষণও বলা যায়। ইহার সৌন্দর্য কখন কখন রচনার সংক্ষিপ্ততায়, কিন্তু অনেক সময়ে একের ধর্ম বা গুণ অন্যের উপরে আরোপ করায়। প্রায়ই অচেতনে চেতনের ধর্ম আরোপ করা হয়, সেই অর্থে ইহা খানিকটা সমাসোক্তি জাতীয়, কিন্তু সমাসোক্তি নহে। কারণ, এখানে উভয়ই প্রস্তাবিত বা প্রকৃত বিষয়, অর্থাৎ প্রস্তাবিত এক বস্তুর ধর্ম তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কিন্তু প্রস্তাবিত অপর বস্তুতে আরোপিত হইতেছে।

উদাহরণ—

(১) "গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন **ক্লান্ত** বরষের
সর্বশেষ গান।" —রবীন্দ্রনাথ

'ক্লান্ত প্রকৃত পক্ষে 'হিয়া'-র বিশেষণ, এখানে 'বর্ষ'-এর উপর আরোপিত হইয়াছে, অতএব ইহা আরোপোক্তি বা উপচরিত বিশেষণ। বর্ষ ক্লান্ত হইতে পারে না, তাই মুখ্যার্থের বাধা হওয়ায় লক্ষণাশক্তি দ্বারা আরোপ বা উপচার সিদ্ধ করা হইল। এখানে 'হিয়া'র ক্লান্তি-ধর্ম 'বর্ষ'-এর উপর আরোপ করা হইয়াছে, কিন্তু 'হিয়া' ও 'বর্ষ' উভয়ই প্রস্তাবিত বলিয়া সমাসোক্তি হয় নাই।

এইরূপ—

(২) "স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল **অলস** আবেশে ;" —রবীন্দ্রনাথ

(৩) অরুণ-বরণ অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি'," —রবীন্দ্রনাথ

(৪) "ওই **বধির** যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
দেখাও তব চির-আলোক-লোক। —রজনীকান্ত সেন

(৫) "ওই **নিঠুর** অর্গল, **করুণ** শুভকরে,
মুক্ত করি' দেহ, আতুর-দীন তরে ;" —রজনীকান্ত সেন

'উন্নাসিক পাণ্ডিত্য', 'নিঃসঙ্গ শয্যা', 'বিনিদ্র রজনী', 'কৌতূহলী প্রশ্ন', 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক', 'ধ্যানস্থ সমুদ্র', 'ব্যাকুল বাসনা', 'অধীর আগ্রহ', 'ব্যগ্র অপেক্ষা' প্রভৃতি উক্তিতে আরোপোক্তি বা উপচরিত বিশেষণের উদাহরণ পাওয়া যায়।

আধুনিক কবিগণের লেখায় 'চালের ধূসর গন্ধ'[১], 'প্রান্তরের সবুজ বাতাস'[১] প্রভৃতি উক্তিতেও উহারই উদাহরণ মিলে। প্রকৃত পক্ষে ঐ দুইটি উক্তি হইতেছে,—'ধূসর চালের গন্ধ' ও 'সবুজ প্রান্তরের বাতাস'। এখানে লক্ষণাশক্তির বলে গন্ধ ও স্পর্শ সম্পর্কে রূপ বা বর্ণ-বাচক শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় বর্ণের আতিশয্য বা ব্যাপক অনুভূতি বিশেষভাবে দ্যোতিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আধুনিক রচনা হইতে এইটি উদাহরণ—

(৬) 'লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী
অধীর আগ্রহ-ভরে বিতরিলো দিকে দিগন্তরে
স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝঙ্কার।" —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ঝঙ্কার হইল শব্দ, কিন্তু তাহার বিশেষণ 'স্বর্ণপ্রভ' রূপ বা বর্ণের এবং 'কবোষ্ণ' স্পর্শের ধর্মবিশেষ বুঝাইয়া থাকে। এখানে লক্ষণাবলে আরোপোক্তি বা উপচরিত বিশেষণ। 'অধীর আগ্রহ'—এখানেও আরোপিত বিশেষণ, কিন্তু জটিলতা কিছু নাই।

আধুনিক কবিদের রচনা হইতে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন—'মেঘের রেশমী আড়ালে',[১] 'ঘুমহারা জান্‌লায়',[২] 'বিষণ্ণ পুকুরজলে',[২] 'প্রভাতের স্বর্ণময় খেলা',[৩] নিরুত্তর নির্বোধ প্রসাদ',[৪] প্রভৃতি।

ইহা ইংরাজীর Transferred Epithet বা Hypallage.

(৪)

ব্যঙ্গ্যোক্তি বা পর্যায়োক্তি

ব্যঞ্জনা-শক্তির প্রয়োগে উক্তিতে যে বিশিষ্ট সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়, তাহার নাম ব্যঙ্গ্যোক্তি বা পর্যায়োক্তি অলঙ্কার।[৫]

ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা লব্ধ অর্থকে ব্যঙ্গ্য অর্থ বলে, তাহা হইতে নাম দেওয়া হইয়াছে ব্যঙ্গ্যোক্তি। প্রাচীনগণের দেওয়া নাম পর্যায়োক্ত বা পর্যায়োক্তি। পর্যায় অর্থ ভঙ্গী বা প্রকার। অতএব পর্যায় বা ভঙ্গী দ্বারা যে অপর অর্থ উক্ত বা দ্যোতিত হয়, তাহাই পর্যায়োক্তি।

ব্যঙ্গ্যোক্তি হইতেছে বিচিত্র ভঙ্গীপূর্ণ এক বক্রোক্তি, যাহাতে দ্বিতীয় অর্থটি বাচ্যার্থের অনুরণন-ক্রমে ধ্বনিত হয় এবং তাহাই ব্যক্যের প্রধান অর্থ হইয়া থাকে।

অভিধা বা লক্ষণাশক্তি নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া বিরত হইলে, যে শক্তির বলে ঐ বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থকে অবলম্বন ও অতিক্রম করিয়া অপর একটি নূতন অর্থের প্রকাশ হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জনাশক্তি। ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা লব্ধ অর্থকে ব্যঙ্গ্যার্থ, দ্যোতিত বা প্রতীয়মান অর্থও বলে। বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের

১। বিষ্ণু দে ২। অমিয় চক্রবর্তী ৩। নিশিকান্ত ৪। বুদ্ধদেব বসু

৫। "ব্যঙ্গ্যস্যোক্তিঃ পর্যায়োক্তম্," —হেমচন্দ্র (কাব্যানুশাসন)

—ব্যঙ্গ্যের উক্তিই পর্যায়োক্তি অলঙ্কার।

প্রাধান্য ও সমধিক মনোহারিত্ব হইলে আলঙ্কারিক পরিভাষায় তাহাকে বলে ধ্বনি। ব্যঙ্গোক্তির ব্যঙ্গ্যার্থ সর্বদাই মুখ্য অর্থ বলিয়া উহা ধ্বনি। ব্যঙ্গোক্তিতে তাই বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ উভয়ই প্রস্তুত বা প্রাসঙ্গিক অর্থ, তবে ব্যঙ্গ্যার্থের সমধিক প্রাধান্য।

অলঙ্কারশাস্ত্রের এক বড় অধ্যায় ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ লইয়া রচিত; তাহার বিশদ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিয়া সাধারণভাবে উহা বুঝান হইতেছে। লক্ষণা, বিশেষতঃ ব্যঞ্জনা-ব্যাপার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে উপমাদি অলঙ্কারও স্পষ্টরূপে বুঝা সম্ভবপর নয়, তাই অর্থালঙ্কারের আলোচনার প্রারম্ভেই লক্ষ্যোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তির ব্যাখ্যান করা হইল।

লক্ষ্যোক্তি আলোচনার প্রসঙ্গে প্রয়োজন-লক্ষণাকে বলা হইয়াছে ব্যঙ্গ্যার্থ-সহিতা। প্রয়োজন-লক্ষণার যাহা প্রয়োজন, তাহার প্রতীতি হয় ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে। 'গঙ্গায় ঘোষেরা বাস করে'—বলিলে লক্ষণাশক্তি-দ্বারা কেবল 'গঙ্গায়' অর্থ 'গঙ্গাতীরে' পাওয়া যায়; কিন্তু শীতত্ব, পাবনত্ব প্রভৃতি প্রয়োজন ধ্বনিত হয় ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা। এই ব্যঞ্জনার নাম লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা। তাই সাধারণতঃ প্রত্যেকটি প্রয়োজন-লক্ষণায়ই একটি লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনার উদাহরণ রহিয়াছে। কিন্তু উহা ব্যঙ্গোক্তির উদাহরণ নহে, কারণ ব্যঙ্গ্যার্থ ঐসকল ক্ষেত্রে প্রধান অর্থ নহে।

বক্তা, বোদ্ধব্য, প্রকরণ, দেশ, কাল, কণ্ঠস্বর বা অঙ্গচেষ্টা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য-হেতু বাক্যের বাচ্যার্থকে আশ্রয় করিয়া ব্যঞ্জনা-শক্তির বলে প্রতীয়মান অর্থটি প্রধান হইলে ব্যঙ্গোক্তি অলঙ্কার হয়। এই ব্যঞ্জনাশক্তি একান্তভাবে অর্থ-গত বলিয়া উহাকে বলা হয় আর্থী ব্যঞ্জনা। উদাহরণ—

(১) 'সূর্য অস্ত গেল।'

বাচ্যার্থ স্পষ্ট। কিন্তু এই বাক্য যদি গুরু শিষ্যকে বলেন, তাহা হইলে শিষ্য বুঝিবে সন্ধ্যাবন্দনাদির বা অধ্যয়নের কাল উপস্থিত। এই বাক্য প্রভু ভৃত্যকে বলিলে ভৃত্য বুঝিবে গোধন আনয়ন বা সান্ধ্যদীপ দানের কাল উপস্থিত। বাক্যটি চোর তাহার চোর বন্ধুকে বলিলে সে বুঝিবে চুরি করিবার

সময় নিকটবর্তী। এইরূপ্ বক্তৃ-বোদ্ধব্য ভেদে আরও অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে।[১]

আর একটি উদাহরণ—

(২) "সুদূর গগনে কাহারে সে চায়?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়?
নব মালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।"

—রবীন্দ্রনাথ (ক্ষণিকা, নববর্ষা)

এখানে প্রকরণ বা প্রসঙ্গ হইতেছে নব বর্ষা। বর্ণনীয় বিষয় বিরহিণী বধূ। নব বর্ষার আগমনে প্রিয়তমের মিলনাকাঙ্ক্ষায় বিরহিণীর চঞ্চল উন্মনা ভাব ধ্বনিত হইতেছে।

বধূর ঘট বাতাসের ও নদীজলের হিল্লোলে ঘাট ছাড়িয়া কোথায় ভাসিয়া গেল! বধূ গিয়াছে ঘট লইয়া নদীর ঘাটে জল আনিতে। কিন্তু প্রবাসী প্রিয়তমের কথা ভাবিয়া সে আনমনা, কোনও দিকে তাহার খেয়াল নাই— ইহাই ব্যঙ্গ্যার্থ।

প্রাচীন অলঙ্কারিকদের উদাহরণ—

(৩) "রাজন্! হের গো তব শত্রুবধূগণ,
দিয়েছ যাদের তুমি নূতন ভূষণ;
স্তনপরে তাহাদের অশ্রু-মুক্তা পড়ে,
তাহাতেই বিনা সুতে হার তারা পরে।"

শত্রু-বিজয়ী রাজার প্রশস্তি-বাক্য। এখানে বাচ্যার্থ শত্রুনারীগণের অবস্থা এবং ব্যঙ্গ্যার্থ শত্রু-ধ্বংস। শত্রু-নারীগণের দুর্দশারূপ কার্য এবং শত্রুধ্বংস-রূপ কারণ উভয়ই প্রস্তুত বা প্রসঙ্গ-ভূত হওয়ায় অলঙ্কার পর্যায়োক্তি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা নয়।

১। তুলনীয়—"I spoke earlier of words as intellectual symbols, and they are, indeed, nothing else so long as they are imprisoned in the dictionary; but as soon as they escape into a living sentence, they gain individuality from the speaker's voice and the expression upon his face, and catch subtle shades of meaning which no dictionary can define a meaning not purely intellectual, and capable of infinite variation to the genius of him that uses them."

—E. Dex Selincourt (*Oxford Lectures on Poetry*)

আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় লক্ষ্যোক্তির ন্যায় এই ব্যঙ্গ্যোক্তিরও প্রচুর প্রয়োগ হয় ; যথা—

(৪) ‘পাকা মাথায় সিন্দূর পর।’

(৫) ‘হাতের লোহা অক্ষয় হোক্।’

ইহাদের ব্যঙ্গ্যার্থ এবং আসল অর্থ হইতেছে,—দীর্ঘজীবী হইয়া স্বামীর সঙ্গে সুখে বাস কর।

(৬) ‘ঘরে প্রতি-বেলায় পঁচিশখানি পাত পড়ে।’

অর্থ—পঁচিশ জন লোক খায়।

এক হিসাবী লোককে দেবতা একটিমাত্র বর দিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

(৭) “নাতিপুতি লইয়া সোনার থালায় পিঠাপায়স খাব।”

অর্থ—দীর্ঘজীবী হইব, নাতিপুতি হইবে, ঐশ্বর্য থাকিবে ; এবং শেষ বয়সেও ভোগ করিবার ক্ষমতা অটুট থাকিবে।

বাক্যগুলির একটিও লক্ষণার উদাহরণ নয়, কোথাও মুখ্যার্থের বাধা হয় নাই।

মূল ব্যঙ্গ্যোক্তি অলঙ্কার সাহিত্যের এক প্রধান অলঙ্কার। সাধারণভাবে ইহার আশ্রয়ে আরও নানাবিধ গৌণ-অলঙ্কার বা সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। ইংরাজী সাহিত্যের Irony, Innuendo, Euphemism-কে ইহারই অন্তর্গত করিয়া আলোচনা করা উচিত।

বিপরীত ভাষণ

বাচ্যার্থে যেখানে নিজ অর্থকে অত্যন্ত তিরস্কৃত অর্থাৎ একেবারে দূরীভূত করিয়া বিপরীত অর্থ বুঝায়, সেখানেই ইহার উদাহরণ।

(১) “অনেক উপকার করিয়াছেন মহাশয়, এ বিষয় আর কি বলিব, এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া দীর্ঘকাল সুখে বাঁচিয়া থাকুন।”

ইহা কোন অপকারী ব্যক্তির প্রতি অপকৃত ব্যক্তির উক্তি। উপযুক্ত কাকু বা কণ্ঠ-স্বরের সহিত উচ্চারিত হইলে আর্থী ব্যঞ্জনার বলে অর্থ হইবে ঠিক বিপরীত,—

অনেক অপকার করিয়াছেন মহাশয়, এ বিষয়ে আর কিছু বলিবার নাই, এইরূপ অনুষ্ঠান আর না করিয়া শীঘ্রই আপনি মরুন !

এই বিপরীত ভাষণের ফলে বিধিবাক্য নিষেধ হইয়া যায়, নিষেধবাক্য হয় বিধি।

(২) "রহিল তোমার এ-ঘরদুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।" —রবীন্দ্রনাথ
এখানে প্রকৃত অর্থ—কেষ্টারে লইয়া আর থাকিও না।

(৩) "এস তো, বাপধন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই।"
—রবীন্দ্রনাথ (রাজা ও রাণী)

যে কণ্ঠ-স্বরে এই বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহাতেই ইহার বিপরীত অর্থ স্পষ্ট হইয়া উঠে।

কুটিল-ভাষণ (Irony)

ইংরাজী Irony ব্যঙ্গোক্তির এই বিপরীত ভাষণেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। ইহাকে পৃথক্ নাম দিলে কুটিল-ভাষণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। কুটিল-ভাষণ দ্বারা ছল-ভাষণ ও খল-ভাষণ উভয়ই একসঙ্গে বুঝান হইতেছে। আঘাত করা উদ্দেশ্য বলিয়া ইহা কেবল ছল-ভাষণ নয়, খল-ভাষণও বটে।

যে ভাষণ বাচ্যার্থে প্রশংসা বুঝাইলেও প্রকরণ এবং বিশেষ ভাবে কণ্ঠস্বরের বলে নিন্দার্থে পর্যবসিত হয়, তাহার নাম কুটিল-ভাষণ।

ইহা কিন্তু ব্যাজস্তুতি নয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ই.বি. কাউএল সাহেব এবং আমাদের দেশীয় কোন কোন পণ্ডিত ব্যাজস্তুতিকে Irony বলিয়া অভিহিত করিলেও, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারে যেখানে প্রশংসা-চ্ছলে নিন্দা হইতেছে, সেখানেও কোনও ব্যঞ্জনা-ব্যাপার নাই, তাহার প্রধান অবলম্বন শ্লেষ, সাধারণতঃ শব্দ-শ্লেষ, কখনও বা অর্থ-শ্লেষ। কুটিল ভাষণে কণ্ঠ-স্বর ও বাচন-ভঙ্গীই নিন্দামূলক বিপরীতার্থটিকে ধ্বনিত করে, শ্লেষ লাগে না। কুটিল-ভাষণ বাস্তব জগতের ব্যাপার, ব্যাজস্তুতি মনে হয় কেবল আলঙ্কারিক জগতের। কুটিল-ভাষণের আঘাতও অতি তীব্র।

১। Irony শব্দ Greek *eiron* (a dissembler) হইতে উৎপন্ন।

তাহা ছাড়া, ব্যাজস্তুতি নিন্দার্থ বুঝাইলেও ঠিক বিপরীতার্থকে না-ও বুঝাইতে পারে। কুটিল-ভাষণে সর্বদাই আথা ব্যঞ্জনার বলে ঠিক বিপরীত অর্থটিকেই উপলব্ধি করায়।

বিপরীত ভাষণের প্রথম ও তৃতীয় উদাহরণ এই কুটিল-ভাষণের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

অপর উদাহরণ—

(১) "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!"

—মধুসূদন দত্ত (মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম সর্গ)

ইহা সমুদ্রের সেতু-বন্ধন লক্ষ্য করিয়া পুত্রশোকাহত রাবণের উক্তি। 'সুন্দর মালা' অর্থ ঠিক বিপরীত কুৎসিত কঠিন বন্ধন। এই অর্থ ব্যঞ্জনার বলে কেবল প্রকরণ ও কণ্ঠস্বর দ্বারাই পরিস্ফুট। 'প্রচেতঃ' শব্দও লক্ষণীয়। উহার একটি অর্থ বরুণ, এখানে সমুদ্র বটে; কিন্তু ব্যঞ্জনার বলে প্রকৃষ্ট-চেতঃ নয়, নষ্ট-চেতঃ—এই অর্থও ধ্বনিত হইতেছে। ইহার পরে আর কুটিল-ভাষণ নাই, সরল ভাষণ দ্বারাই সমুদ্রের আচরণের নিন্দা এবং রাবণের চিত্ত-ক্ষোভ বর্ণিত হইয়াছে।

বক্র-ভাষণ (Innuendo[১])

Innuendo Irony-এর ন্যায় ব্যঙ্গোক্তিরই একটি বিশিষ্ট রূপ, তবে ইহা বিপরীত ভাষণ নহে। ইহার নাম দেওয়া হইল বক্র-ভাষণ।

যে ভাষণ ব্যক্তব্য বিষয়কে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না করিয়া পরোক্ষভাবে ধ্বনিত করে, তার নাম বক্র-ভাষণ।

বাচন-ভঙ্গীতে কুটিল ভাষণের সহিত ইহার পার্থক্য স্পষ্ট; তবে ইহারও উদ্দেশ্য নিন্দা করা বা মর্মে আঘাত করা। এখানে আসল ব্যক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অনুমান-বলে তাহা সহজেই গোচর হয়।

(১) "আজকাল নেতাদের অনেকেই বেশ প্রোগ্রেসিভ, যদিও অবস্থানুযায়ী তাদের সকলেরই মত তাড়াতাড়ি মত বদলায় না।"

১। Latin *innuendo*—by making a nod, i.e., by an oblique hint.

এখানে ব্যঙ্গ-পূর্ণ দ্যোতনা হইতেছে এই যে, "আজকাল তারাই প্রোগ্রেসিভ যাদের মত অবস্থানুযায়ী তাড়াতাড়ি বদলায়।" প্রোগ্রেসিভদের সম্পর্কে বক্র-ভাষণ।

(২) "ব্যবসায়ী সে, তবে হয়তো ঠকাইবে না।

এখানে দ্যোতনা—ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ ঠকায়।

(৪) "না, আর ডাক্তার ডাকিও না, ধীরে ধীরে শান্তিতে মরিতে চাই।"

ইঙ্গিত এই,—ডাক্তারের চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি মৃত্যু হইবে, যন্ত্রণার মধ্যে।

(৫) "নূতন কবিতার বইখানি, ছবি, ছাপান ও বাঁধাই কি চমৎকার!"

সমালোচনা এইরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, কবিতাগুলি মোটেই চমৎকার নয়। কবির নিন্দা করাই আসল উদ্দেশ্য। তাহা সহজেই গোচর হয়।

সু-ভাষণ (Euphemism[১])

যে ভাষণ কঠিনকে কোমল বা অপ্রিয়কে যথাসম্ভব প্রিয়-আকারে উপস্থিত করে, তাহার নাম সু-ভাষণ।

ইহাকেও ব্যঙ্গোক্তির ভেদ বলা যাইতে পারে। বক্র-ভাষণে কঠিন আঘাত করাই উদ্দেশ্য, সু-ভাষণে আঘাতটিকে যথাসম্ভব কোমল করা উদ্দেশ্য। একের পশ্চাতে দ্বেষ, অপরটির পশ্চাতে সহানুভূতি, ভয় বা শিষ্টাচারবোধ। উদাহরণ—

(১) "বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥"

—ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল)

দক্ষ-যজ্ঞে দক্ষের বিনাশের পর শিবকে প্রসন্ন করিবার জন্য দক্ষ-পত্নী প্রসূতির স্তব। প্রথম চরণের আসল অর্থ—বেদে তোমার মহিমা কীর্তিত নাই, তুমি বৈদিক দেবতা নহ। কিন্তু সে কথা বলা হয় নাই।

১। Greek *eu*—well, এবং *phemi*—I speak.

(২) "আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে,
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।" —রবীন্দ্রনাথ

অর্থ—চুরি করেন। ভদ্রলোকের ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বর্ণনা করা হইল। আমাদের চলিত ভাষার বলে —'তাহার একটু হাতটান রোগ আছে।'

(৩) "তিনি আত্ম-অনুকরণের নিগড়ে আজ বন্দী। —বুদ্ধদেব বসু

অর্থ—তিনি নূতন সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না, থোড়-বড়ি-খাড়া চলিতেছে।

(৪) 'তোমার কথার কোন ভিত্তি নাই', 'এ কথা উর্বর কল্পনা-প্রসূত', 'কথা শুনিয়া মনে হয় তোমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইয়াছে',—প্রভৃতি উক্তি।

উহাদের সরল অর্থ—কথাটি মিথ্যা।

পল্লবিত ভাষণ (**Periphrasis**[১])

যে ভাষণে বক্তব্যকে এক কথায় স্পষ্টভাবে না বলিয়া অনেক ঘুরাইয়া বলা হয়, তাহার নাম পল্লবিত ভাষণ।

ইহাকেও অনেক সময়ে পর্যায়োক্তির অন্তর্গত করা যাইতে পারে। উপরের (২) এবং (৪)-এর উদাহরণ পল্লবিত ভাষণের দৃষ্টান্ত বলিয়া উপস্থিত করা যাইতে পারে। তবে উক্তিটিকে কোমল ও যথাসম্ভব প্রিয় করিবার জন্য উহার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া উহাদিগকে পল্লবিত ভাষণের পর্যায়ে না ফেলিয়া সু-ভাষণের পর্যায়ে ফেলাই উচিত বলিয়া মনে হয়। পল্লবিত-ভাষণ দ্বারা অনেক সময়ে বাক্যে জোর বা গুরুত্ব আসে। উদাহরণ—

"ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্বাশার হৈমদ্বার পদ্মকর দিয়া
কালি," —মধুসূদন দত্ত

এখানে অর্থ—প্রত্যূষে অরুণোদয়ে।

পল্লবিত ভাষণ কিন্তু কেবল বাগ্‌বিস্তার বা বাগাড়ম্বর নয়, কেননা তাহাতে কোন সৌন্দর্য থাকে না, এবং সৌন্দর্য না হইলে অলঙ্কার হয় না।

"সকলে দৃষ্টি-বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া মানসক্ষেত্রে তুষ্টির বীজ বপন করুন।
—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১। Greek *peri*—around এবং *phrasis*—saying.

এই বাক্য 'সকলে দেখিয়া সন্তোষ লাভ করুন'—ইহারই আড়ম্বর-পূর্ণ বিস্তার। এই বিস্তার দ্বারা মূল অর্থ আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিছুমাত্র অলঙ্কৃত হয় নাই।

পল্লবিত-ভাষণে কিছুমাত্র ব্যঞ্জনা ব্যাপার না থাকিলে উহা আমাদের আলোচ্য ব্যঙ্গ্যোক্তির অন্তর্গত হইবে না।

সাদৃশ্য-মূল অলঙ্কার

উপমা

সাধর্ম্য-সূত্রে আক্ষিপ্ত ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সহিত সাদৃশ্য-কথন দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তাহার নাম উপমা-অলঙ্কার।

উপমা অর্থ তুলনা, অর্থাৎ সাদৃশ্য-কথন। সাদৃশ্য হইতেছে দুইটি ভিন্ন-জাতীয় বস্তুর, যাহাদের পরস্পরের বৈধর্ম্য থাকে অনুল্লিখিত এবং কেবল প্রসঙ্গোচিত সাধর্ম্য হয় উল্লিখিত।[১] এই দুইটি বস্তুর একটি হইতেছে বর্ণনীয় বিষয়, অপরটি তাহারই সাধর্ম্য-সূত্রে আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট বাহিরের পদার্থ। এইজন্য কেবল দুইটি বিজাতীয় পদার্থের সাধর্ম্য বা সাম্য বলিলে উপযুক্ত সংজ্ঞা হয় না।

এরিষ্টট্‌ল্ যথার্থ বলিয়াছেন, বৈধর্ম্যসত্ত্বেও সাধর্ম্য উপলব্ধি করা প্রতিভার কার্য।[২] এই প্রতিভা কবি-প্রতিভা। যাহার অনুভূতি যত সূক্ষ্ম এবং বাসনা-লোক যত সমৃদ্ধ, মনোজগৎ ও নিসর্গ-জগতের যাবতীয় বস্তু অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সুষমা লইয়া তত সহজে তাহার কাছে ধরা দেয় এবং তাহার কবি-কর্ম তত শ্রী-ময়, ধী-ময় ও রস-ময় হইয়া উঠে। একটি প্রচলিত উদাহরণ—

'মুখখানি চাঁদের মত সুন্দর।'

১। (ক) "সাম্যং বাচ্যম্ অবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ"—সাহিত্যদর্পণ, ১০ম পরিঃ বস্তু দুইটির বৈধর্ম্য থাকা চাই, এবং বৈধর্ম্য বাদ দিয়া কেবল সাধর্ম্যের উল্লেখ হওয়া চাই।

(খ) "A simile is the discovery of likeness between two objects or two actions in their general nature dissimilar..." —*Dr Johnson*

২। "—and it is also a sign of genius, since a good metaphor implies an intuitive perception of the similarity in dissimilars."

—*Aristotle* (On the Art of Poetry)

এখানে মুখ ও চাঁদ ভিন্ন জাতীয় বস্তু, বৈধর্ম্য তাহাদের অনেক, সাধর্ম্য রহিয়াছে সৌন্দর্য-সূত্রে। এই সৌন্দর্য দ্বারা অভিভূত হইলেই ভূতলের মুখের পাশে আকাশের চাঁদ বা সরসীর পদ্ম প্রভৃতি আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হইয়া ভিড় করে, এবং সাদৃশ্যকথন দ্বারা উপমা সম্পন্ন হয়।

উপমার চারিটি অঙ্গ

উপমার সংজ্ঞা লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে,—বর্ণনীয় বিষয়, আক্ষিপ্ত বস্তু, সাধর্ম্য বা সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্য-বাচক শব্দ এই চারিটি উপমার অঙ্গ। উপমার দিক্ হইতে ব্যুৎপন্ন করিয়া বর্ণনীয় বিষয় ও আক্ষিপ্ত বস্তুকে বলা হয় উপমেয় ও উপমান। তাহা হইলে উপমার চারিটি অঙ্গ হইতেছে,—উপমেয়, উপমান, সাধারন ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

(১) **উপমেয়**—যাহাকে তুলনা করা যায়, অর্থাৎ উপমার বিষয়ীভূত করা যায় ; উপরোক্ত বাক্যে 'মুখখানি'। ইহাই প্রকৃত বিষয় ও বর্ণনীয় বিষয়। ইহাকে কেবল 'বিষয়'ও বলা হইয়া থাকে। সংস্কৃতে উপমেয়কে সাধারণতঃ বলে প্রস্তুত বস্তু। প্রস্তুত অর্থ প্রস্তাবিত অর্থাৎ প্রসঙ্গ-বলে প্রাপ্ত। আমরা বলিতে পারি বর্ণনীয় বস্তু।

(২) **উপমান**—যাহার সহিত তুলনা দেওয়া হয় ; উপরোক্ত বাক্যে 'চাঁদ'। ইহাকে বলা হয় অপ্রকৃত বা বিষয়ী। সংস্কৃতে অনেক সময়ে ইহাকে বলে অ-প্রস্তুত বস্তু, অর্থাৎ যে বস্তু প্রস্তাবিত নহে, যাহা বাহির হইতে আহৃত। আমরা ইহাকে বলিব আক্ষিপ্ত[১] বস্তু। প্রস্তুতের বহির্ভূত প্রত্যেক বস্তুই অ-প্রস্তুত, তাহা দ্বারা নির্দিষ্ট রূপে বিশিষ্ট কিছু বুঝা যায় না। কেবল উপমেয় বা বর্ণনীয় বিষয় দ্বারা অর্থাৎ উপমেয়ের আশ্রিত গুণ, ভাব বা রস দ্বারা যাহা আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয়, তাহাই খাঁটি উপমান।

সাধারণ ধর্ম—যে ধর্ম উপমেয় ও উপমান উভয়ে সাধারণ, অর্থাৎ সমান-ভাবে বর্তমান ; উপরোক্ত বাক্যে 'সুন্দর', যথা—মুখ সুন্দর, চাঁদ সুন্দর। ইহারই বলে বাহিরের একটি বিশেষ বস্তু বর্ণনায় আক্ষিপ্ত হয় এবং তুলনা সম্পন্ন হয়। ইহাই উপমার ভিত্তি-স্থানীয়।

১। তুলনীয়—"রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্য-ক্রিয়ো ভবেৎ।" —ধ্বন্যালোক, ২।১৭

এই সাধারণ ধর্ম কোথাও গুণ, কোথাও ক্রিয়া, কোথাও বা এই উভয় হইয়া থাকে।

উদাহরণ—

গুণ—(ক) 'মুখখানি চাঁদের মত সুন্দর।'
(খ) 'দেহখানি লোহার মত কঠিন।'

'সৌন্দর্য' 'কাঠিন্য' সকলই গুণ।

ক্রিয়া—(ক) 'মুখখানি চাঁদের মত হাসে।'
(খ) "রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কই মাছের মত ধড়ফড় করে।" —রবীন্দ্রনাথ

'হাসা' বা 'ধড়ফড় করা' ক্রিয়া।

গুণ ও ক্রিয়া উভয়—(ক) "জ্বলে উঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি—
এ যে তোমার তরবারি।" —রবীন্দ্রনাথ

'জ্বলিয়া উঠা' ও 'ভার' যথাক্রমে ক্রিয়া ও গুণ।

সাধারণ ধর্মের অভিব্যক্তি তিন প্রকারে স্বীকৃত হইয়া থাকে; যথা—অভিন্নতা বা একরূপতা, পরিস্ফুট সাদৃশ্য, প্রণিধানগম্য বা দূরগত সাদৃশ্য।

অভিন্নতা বা একরূপতা—

যেখানে সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ উভয়নিষ্ঠ গুণ বা ক্রিয়া একপদ দ্বারা স্থাপিত হয়, সেখানে অভিন্নতার উদাহরণ। উপরের সমস্ত উদ্ধৃতিই উহার দৃষ্টান্ত-স্থল। যেখানে সাধর্ম্য-বাচক শব্দ নানারূপে আবৃত হইতে থাকে, সেখানে একরূপতার উদাহরণ; যথা—

"ঘন বনে হেরি দূরে যথা
মৃগবরে **চলে** ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগ-প্রয়াসী; কিংবা নদী-গর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র **ধায়** তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ **চলিলা** সত্বরে।" —মধুসূদন দত্ত

পরিস্ফুট সাদৃশ্য—

এখানে সাধারণ ধর্ম ভিন্ন কিন্তু অনেকটা সমার্থক শব্দদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহা ফলিতার্থে এক বলিয়া সাদৃশ্য অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এইরূপ স্থলে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধকে **বস্তু-প্রতিবস্তু সম্বন্ধ** এবং সাধারণ ধর্মকে **বস্তু-প্রতিবস্তু-ভাবাপন্ন** বলা হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসারণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে
করপদ্ম সঞ্চালনে।" —মধুসূদন দত্ত

এখানে মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত শঙ্খঘণ্টা প্রভৃতি অনায়াসে 'দূরে ফেলান' এবং মশকবৃন্দ 'খেদান' এই উভয় ক্রিয়া ফলিতার্থে এক; অতএব সাধারণ ধর্ম বস্তু-প্রতিবস্তু-ভাবাপন্ন।

প্রণিধানগম্য বা দূরগত সাদৃশ্য—

এখানে উভয়ের ধর্মই কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার বলিয়া ভিন্ন শব্দ দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং উহা ফলিতার্থে এক হয় না। সাদৃশ্য এখানে প্রণিধানগম্য,[১] অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতে হয়। এইরূপ স্থলে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধকে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ** এবং সাধারণ ধর্মকে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন** বলা হইয়া থাকে। বস্তু-প্রতিবস্তু-সম্বন্ধ-স্থলে সাধারণ ধর্মের কার্যতঃ অভেদ, সাদৃশ্য তাই পরিস্ফুট; বিম্ব-প্রতিবিম্ব-সম্বন্ধ-স্থলে সাদৃশ্য প্রণিধান-গম্য তাই দূরগত।

উদাহরণ—

"যথা পথে সহসা হেরিলে
উর্ধ্বফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।" —মধুসূদন দত্ত

এখানে 'সর্পদর্শন-ভীত পথিকের গতি স্তব্ধ হওয়া' এবং 'মেঘনাদের বিহ্বলভাবে লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা'—এই উভয়ের মধ্যে কেবল প্রণিধান-

---

১। "...সামান্যধর্মস্য প্রতিবিম্বনং প্রণিধান-গম্য-সাম্যত্বম্।" —রামচরণ তর্কবাগীশ (সাহিত্যদর্পণের টীকা)

গম্য বা দূরগত সাদৃশ্য বর্তমান। অতএব সাধারণ ধর্ম বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন।

প্রতিবস্তূপমা ও দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের আলোচনায় এই বস্তু-প্রতিবস্তু ও বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ আরও স্পষ্ট হইবে।

(৪) **সাদৃশ্য-জ্ঞাপক শব্দ**—এইগুলি উপমেয় ও উপমানকে সাধর্ম্য-সূত্রে একসঙ্গে গাঁথে। এইগুলি হইতেছে,—যথা, যেমন, 'জনু', যেন, হেন, মত, মতন, তুল্য, সদৃশ, সম, সমান, ন্যায়, নিভ, সঙ্কাশ, প্রায় বা পারা, ভাতি, রীতি প্রভৃতি শব্দ ; বা বৎ, ক্যঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়। কয়েকটি উদাহরণ—

(ক) 'জনু'—"নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজপাতা॥" —বিদ্যাপতি
জনু = যেন

(খ) "না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥" —ভারতচন্দ্র

(গ) 'হেন'—"কানু হেন ধন পরাণে বধিলি একাজ করিলি কি!"—চণ্ডীদাস

(ঘ) 'মতন'—চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।" —রবীন্দ্রনাথ

(ঙ) 'সমান'—"শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।" —রবীন্দ্রনাথ

(চ) 'পারা'—'অধীর পাগল-পারা', —বাংলা গান

(ছ) 'ভাতি'—"পুরাণ বসনভাতি অবলাজনের জাতি," —মুকুন্দরাম

(জ) 'রীতি'—"কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়" —চণ্ডীদাস

(ঝ) 'বৎ' প্রত্যয়—"তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি।" —রবীন্দ্রনাথ

'চন্দ্রবৎ আহ্লাদকর', 'লৌহবৎ কঠিন' ইত্যাদি।

(ঞ) ক্যঙ্ প্রত্যয়—"সীতা রামমুখ-বিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনপরম্পরা
শ্রবণ-গোচর করিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন," —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অমৃতায়মান—অমৃত + ক্যঙ্ + শানচ্, যাহা অমৃতের ন্যায় আচরণ করে, অর্থাৎ অমৃতের ন্যায় বোধ হয়।

উপমেয় ও উপমান

পূর্বেই বলা হইয়াছে উপমেয়ের ধর্মের প্রগাঢ় অনুভূতির বলে বাসনা-লোক হইতে উপমানসমূহ স্বতঃ আবির্ভূত হইতে থাকে। উপমেয় বস্তু বা গুণ

হইতে পারে, উপমানও ভিন্নজাতীয় বস্তু বা গুণ হইতে পারে। তাহা হইলে সাধারণতঃ মোট তিন প্রকারে উপমা সম্পন্ন হইতে পারে ; যথা—

(১) বস্তুর সহিত বস্তুর উপমা—

(ক) "কনকলতার প্রায় জনক-দুহিতা,
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা ?" —কৃত্তিবাস

সাহিত্যে সর্বত্রই এই শ্রেণীর উপমার উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

(২) বস্তুর সহিত গুণের উপমা—

(ক) "হাসি দেখা দিলা ঊষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখ-তমোবিনাশিনী।" —মধুসূদন

(খ) 'হত্যার মত ভয়ঙ্কর', 'হিংসার মত বক্র', 'দুঃখের মত নিবিড়', 'নিয়তির মত অব্যর্থ' ইত্যাদি।

(৩) গুণের সহিত বস্তুর উপমা—

(ক) "বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।" —রবীন্দ্রনাথ

(খ) "স্নেহ শিশিরের মত পবিত্র, হ্রদের মত স্বচ্ছ।" —দ্বিজেন্দ্রলাল

গুণের সহিত গুণের উপমা বড় দেখা যায় না ; কারণ, গুণের সহিত বিজাতীয় গুণের কোনও সাধর্ম্য সম্ভবপর নয়।

উপমানের সার্থকতা

সাদৃশ্য-মূল অলঙ্কারে উপমান বা আক্ষিপ্ত-বস্তু উপমেয় বা বর্ণনীয় বিষয় অপেক্ষা গুণে ও ধর্মে বড় হওয়া আবশ্যক। উহা ছোট হইলে, এমন কি প্রায় সমান হইলেও, বিশেষ কোন সৌন্দর্যের সঞ্চার হয় না ; যথা—

"মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গ-ধর ; স্বর্ণফুলশ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধড়া যেন !

নির্ঝর-ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ !"

—মধুসূদন দত্ত (মেঘনাদবধ কাব্য, ২য় সর্গ)

বালগোপালকে আনা হইয়াছে কৈলাস-পর্বতকে বুঝাইবার জন্য ! তাহার পরে যতই কবি স্বর্ণফুলশ্রেণী ও পীতধড়া এবং নির্ঝরবারি ও শ্বেতচন্দনলেপের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করুন, কৈলাস পর্বতের কোন উপলব্ধি আমাদের হয় না। বরং উপমান মাধবের সৌন্দর্যই এই উপমেয়ের পার্শ্বে আসিয়া নব মহিমা লাভ করিয়াছে।

সাধারণতঃ উপমান অতিপরিচিত বা একান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয়সমূহ হইতে, অথবা একান্ত অপরিচিত এবং দুর্বোধ বিষয়সমূহ হইতে সংগ্রহ করা উচিত নয়। তবে নিত্য-পরিচিত ব্যাপারের সহিত সাদৃশ্য-যোজনা দ্বারাও অনেক সময়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়; এবং তাহাতে কেবল যে সুস্পষ্টতা আসে তাহা নয়, অভীপ্সিত ভাব ও রসমূর্তিও সহজে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবিগণের কবিতায় আহৃত অনেক উপমান ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। উপমা অলঙ্কার তো বৈদিকযুগে এবং সকল যুগেই সর্বাধিক ব্যবহৃত অলঙ্কার। কবিগণের প্রতিভার পরিচয় হইল অভিনব সাদৃশ্য উপলব্ধির ফলে নূতন উপমান-আহরণে, নূতন অপ্রস্তুত-যোজনায়। তাহারই ফলে সুস্পষ্টতা, সুমূর্ততা বা রূপায়ণ, অভিনব ব্যঞ্জনা বা ব্যাপকতর রসচেতনা, অন্তর ও বহির্জগতের সমীকরণ এবং অপরূপ সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। 'উপমাই কবিত্ব', অথবা, 'উপমাতেই কবিত্ব'—ইহার কোনও কথাই সম্পূর্ণ সত্য নয় ; কিন্তু উপমা পরীক্ষা করিলে প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্য যে অনেকখানি ধরা পড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপমানের সার্থকতা অর্থাৎ উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক প্রভৃতি সাদৃশ্য-মূল অলঙ্কারে অপ্রস্তুত-যোজনার সার্থকতা সাধারণতঃ চারি ভাগে উপলব্ধি করা যায় ; যথা—

(১) সুস্পষ্টতা—

এখানে উপমা উদাহরণের কাজ করে, সাধারণ ধর্মটিকে পরিস্ফুট করিয়া বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে ; যথা—

(ক) প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক অন্ধ-পঙ্গুর ন্যায়।

প্রকৃতি অন্ধ জড়, কিন্তু গতি-শক্তি তাহারই। পুরুষ পঙ্গুর ন্যায় দৃষ্টিমান্ বটে, কিন্তু চলচ্ছক্তি-রহিত। উভয়ের মিলনে সৃষ্টি হয় এবং জগৎ-সংসার চলে। উভয়ের বিচ্ছেদেই প্রলয়। উপমার এইরূপ প্রয়োগ গদ্যে, বিশেষতঃ দর্শনাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

(খ) "কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥"
—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

(২) সুমূর্ততা ও নবসৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা—

উপমানের প্রয়োগে উপমেয় যেন নবরূপে মূর্ত হইয়া সরস হইয়া উঠে এবং উপমানের পরিবেশ হইতে নব সৌন্দর্য আহরণ করিয়া তাহাতে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহাই কাব্যের রূপায়ণ, ইহাই কাব্যের এবং কাব্য-ধর্মাশ্রিত গদ্যের উপমা। উদাহরণ—

(ক) "তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি ঊর্ধ্বে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে।"
—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পালামৌ-ভ্রমণের কালে দৃষ্ট এক বাই-জীর রূপবর্ণনা। ইহারই ব্যাখ্যান ও আস্বাদন-ক্রমে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"এই উপমাটি পড়িবামাত্র মনে বড় একটি আনন্দের উদয় হয়; কেবলমাত্র উপমা-সাদৃশ্য তাহার কারণ নহে, কিন্তু সেই সাদৃশ্যটুকুকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া একটা সৌন্দর্যের সহিত আর কতকগুলি সৌন্দর্য জড়িত হইয়া যায়;—সে একটা ইন্দ্রজালের মত;—ঠিক করিয়া বলা শক্ত যে, অপরাহ্ণের অতি দূর নির্মল নীলাকাশে ভাসমান স্থিরপক্ষ স্থগিতগতি পাখীটিকে দেখিতেছি, না, যুবতির শুভ্রসুন্দর ললাটতলে অঙ্কিত একটি জোড়া ভুরু আমাদের চক্ষে পড়িতেছে!—জানিনা, কেমন করিয়া কি মন্ত্র বলে একটি ক্ষুদ্র ললাটের উপর সহসা আলোকধৌত নীলাম্বরের অনন্ত বিস্তার আসিয়া পড়ে এবং মনে হয় যেন রমণী-মুখের সে ভ্রূ-যুগল দেখিতে স্থিরদৃষ্টিকে বহুউচ্চে বহুদূরে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। এই উপমায় হঠাৎ এইরূপ একটা বিভ্রম উৎপন্ন করে—কিন্তু সেই ভ্রমের কুহকেই সৌন্দর্য ঘনীভূত হইয়া উঠে।" —আধুনিক সাহিত্য

এখানে অলঙ্কারটি মূলতঃ উৎপ্রেক্ষা।

(গ) "দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়" —বলরাম দাস

এখানেও ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 'দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়' এই এক কথায় বলরাম দাস কি না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখীর মত উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তি লাভ করিয়াছে।" —সাহিত্য (সাহিত্যের তাৎপর্য)

এখানে অলঙ্কারটি মূলতঃ রূপক।

(গ) "লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার॥" —বিদ্যাপতি

—চক্ষুর তারা যেন স্থির ভৃঙ্গের ন্যায়—মধুতে বিভোর হইয়া উড়িতে পারিতেছে না।

এখানে অলঙ্কার উপমাই বলিতে হইবে। উপমাটি একটি ব্যাপকতর রসচেতনার সার্থক সঙ্কেত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাখ্যান নিষ্প্রয়োজন।

(ঘ) "এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ; আহা মরি সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ!"

—মধুসূদন দত্ত (মেঘনাদবধ কাব্য,) ৪র্থ সর্গ

সীতার চরণতলে সরমা, যেন তুলসীর মূলে সুবর্ণদীপ। অপ্রস্তুতযোজনা বা উপমানের প্রয়োগ এখানে কালিদাসের উপমার ন্যায় সার্থক হইয়াছে। নিরাভরণা বন্দিনী সীতা যেন তুলসী বৃক্ষ, মূর্তিমতী পবিত্রতা। সীতার অঙ্গ-জ্যোতির কথা কবি পূর্বেই বলিয়াছেন,—"একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী তমোময় ধামে যেন!" সরমা রক্ষঃকুল-রাজবধূ, সর্বাঙ্গে মণিময় আভরণ, যেন সুবর্ণ-দীপ। এই দীপ-জ্যোতি, যাহা দশ দিক্ উজ্জ্বল করিয়াছে, তাহা সরমার রূপ, এবং বিশেষভাবে তাঁহার রাজৈশ্বর্য-ব্যঞ্জক। তথাপি দীপ যেমন তুলসীর মূলে নিবেদিত হইয়া ধন্য হয়, সরমাও সেই প্রকার সীতাদেবীর চরণোপান্তে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। সন্ধ্যায় তুলসীমূলে

দীপদানই তুলসীর আরাধনা, তাহা তুলসী-প্রিয় বিষ্ণুর আরাধনাও বুঝায়। এখানেও সরমার উপস্থিতি সীতা দেবীর এবং সীতাপতি রামচন্দ্রের আরাধনা বুঝায়। সরমা বিভীষণের পত্নী, যে বিভীষণ এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রিত।

মূল অলঙ্কার উপমা অপেক্ষা উৎপ্রেক্ষাই বেশি সঙ্গত মনে হয়।

সুমূর্ততাই রূপায়ণ বা রূপোল্লাস, রূপায়ণ সিদ্ধ হইলে নব সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা বা ব্যাপকতর রস-চেতনা আসে। ইহা হইতে উপমানের সার্থকতা আরও দুই প্রকারে উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রথম, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমীকরণ; দ্বিতীয়, অলঙ্কারের মালা-প্রয়োগে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য-জগতের সৃষ্টি।

(৩) অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমীকরণ—

অন্তর্জগৎ অর্থ মনোজগৎ। সমীকরণ অর্থ সামঞ্জস্যময় একরূপতা। উপমেয় ও আক্ষিপ্ত উপমানের সাধর্ম্য-বোধই এই একরূপতা। ইহা বিচিত্র বস্তু ও গুণের মধ্যে এক সঙ্গতিময় নিয়ম, অথবা বিচিত্র প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে এক প্রীতিময় সামঞ্জস্য স্থাপন করে, এবং আমাদের বিশেষ অনুভূতিকে নির্বিশেষের অভিমুখী করিয়া দেয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—

"পৃথিবীর সুন্দর পদার্থগুলি পৃথক্ হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। চাঁপাফুলের ঘ্রাণেও বেহাগ রাগিণীর কথা মনে পড়িতে পারে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি তাহা ধরিয়া ফেলেন। জগতের এই লতাপুষ্পপল্লব ও নরনারীচিত্র এক তুলির আলেখ্য, সেই একত্বের গন্ধ অনুভব করিতে মনের একটা শক্তি আছে, চক্ষুকর্ণের ন্যায় তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমা-যোজনায় ব্যক্ত হয়।"

—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

এই শক্তিই এরিষ্টটল্-কথিত সেই প্রতিভা, যাহা বিসদৃশের মধ্যে সদৃশকে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রতিভার অধিকারী কবি। সেই কবির মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রকাশ' কবিতায়। কবিরই চক্ষে প্রথম প্রকাশ পায় ভুবনে ভুবনে যত গোপন মিলন, অন্তরে প্রকাশ পায় জগতের ঐক্য-গাথা,—

"হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহেনি কথা।
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা ;
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে ;
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি ;
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে-কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে।"

কবি শেলির 'Love's Philosophy' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মন্তব্য করিয়াছেন,—"উপমার আর একটি কাজ হচ্ছে,—প্রাকৃতিক নিয়মের একটা সামঞ্জস্য দেখানো। যেমন, যদি বলি,—

'রমণীর রূপের মোহে প'ড়ে পুরুষজাতি মারা যায়, যেমন বহ্নিতে পতঙ্গ পুড়ে মরে।'

—এ উপমা এস্থানে বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে একটা সম্বন্ধ দেখিয়ে দেয়।"

—চিন্তা ও কল্পনা

বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি উদাহরণ—

"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।"

—মধুসূদন দত্ত, মেঘনাদবধ (৬ষ্ঠ সর্গ)

গত-প্রাণ মেঘনাদের বর্ণনা। ইহারই আস্বাদনে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বলিতেছেন—"মরণাহত, ভূপতিত মেঘনাদকে দিগন্ত-আশ্রয়ী অস্তমান সূর্যের সহিত উপমিত করায়, উপমেয়কে যেমন বিশিষ্ট গৌরব দান করা হইয়াছে, তেমনই উপমানকেও এমন একটি করুণ মহিমায় নূতন করিয়া আমাদের চক্ষে ধরা হইয়াছে যে সমগ্র সৃষ্টিব্যাপী একই অখণ্ডনীয় নিয়তির লীলা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই—আমাদের অনুভূতি বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নির্বিশেষের অভিমুখী হয়।"

—কবি শ্রীমধুসূদন

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, উপমা-দুইটি মূলতঃ আদিকবি

বাল্মীকির ব্যবহৃত। গত-জীবিত মেঘনাদকে বর্ণনা করিতেই রামায়ণে তিনি উহাদের প্রয়োগ করিয়াছেন।

মূল চরণটি এই—

"শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।"—রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৯০।৮২

সমাসোক্তি অলঙ্কারে যেখানে প্রস্তুতে অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপ করিয়া বর্ণনা সিদ্ধ হয়, সেখানে এই সমীকরণের চূড়ান্ত উদাহরণ পাওয়া যাইবে। পরবর্তী মালা-উপমানের উদাহরণগুলির মধ্যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের এই সঙ্গতিময় ঐক্যবোধ বা সমীকরণ সর্বাপেক্ষা সহজে পরিস্ফুট হইবে।

(৪) অভিনব সৌন্দর্য-লোকের সৃষ্টি—

পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাতে উপমানের মালা-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় এবং ইহা মূলতঃ 'নবসৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা'র অন্তর্গত; তাহারই পুঞ্জ পুঞ্জ প্রয়োগে অতি ব্যাপক রসচেতনার সহিত একটি নির্বিশেষ অনুভূতিময় অভিনব সৌন্দর্য-লোকের সৃষ্টি ঘটে। উদাহরণ—

(ক) "সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকা-রাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎতুল্য,—দুর্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য।"—

—বঙ্কিমচন্দ্র (চন্দ্রশেখর)

অলঙ্কার এখানে মালোপমা। উপমাগুলি লুপ্তোপমা, কেননা সাধর্ম্যের উল্লেখ নাই।

(খ) "তাঁর কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা, তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ।" —বঙ্কিমচন্দ্র (চন্দ্রশেখর)

এখানে বারোটি উপমানের মালোপমা। উপমাগুলি এখানেও লুপ্তোপমা, কেননা, সাধর্ম্য ও সাদৃশ্য-বাচক শব্দ কোনটিরই উল্লেখ নাই।

(গ) জীবানন্দ-জায়া শান্তি

"মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছে কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল। বোধ হইল যেন কোথায় গোলাপ জলের

কার্বা মুখ-আঁটা ছিল, কে কার্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ; যেন কে নিবান আগুনে ধূপ-ধূনা-গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল।”

—বঙ্কিমচন্দ্র (আনন্দমঠ)

এখানে মালা-উৎপ্রেক্ষা। কি অপরূপ সৌন্দর্যের পরিবেশ!

উপমার চারি ভেদ

বর্ণনার প্রকার অনুসারে উপমা-অলঙ্কারের চারিপ্রকার ভেদের কথা বলা যাইতে পারে ; যথা—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মহোপমা এবং মালোপমা। স্মরণ অলঙ্কারকেও স্মরণোপমা নাম দিয়া উপমার এক ভেদ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

পূর্ণোপমা

যে উপমায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্য-বাচক শব্দ—এই চারিটি অঙ্গ সকলই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে, তাহার নাম **পূর্ণোপমা**। পূর্বের উদাহরণসমূহে অনেক পূর্ণোপমা রহিয়াছে। এখানেও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

(ক) “বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।”

—রবীন্দ্রনাথ

সাধারণ ধর্ম—ফুটিয়া রহে।

(খ) “কি কব লজ্জার কথা লতা লজ্জাবতী যথা
মৃত প্রায় পর-পরশনে।”

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মিনীর বর্ণনা।

(গ) “সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!” —জীবনানন্দ দাশ

(ঘ) “ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—
ডালিম ফুলের মত ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মত লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি যার গোধূলির মত গোলাপি রঙিন,
তারে আমি দেখিয়াছি প্রতিরাত্রে—স্বপ্নে—কত দিন।”

—জীবনানন্দ দাশ

এখানে ২য় বা ৩য় চরণের দ্বিতীয় উপমাটি পূর্ণোপমা এবং প্রথম উপমাটি লুপ্তোপমা।

লুপ্তোপমা

যে উপমায় সাদৃশ্যবাচক শব্দ, সাধারণ ধর্ম এবং উপমান,—এই তিনটি অঙ্গের একটি, দুইটি বা তিনটি অঙ্গই লুপ্ত অর্থাৎ উহ্য থাকে, তাহার নাম **লুপ্তোপমা**। উদাহরণ—

সাদৃশ্য-বাচক শব্দ লুপ্ত—

(ক) "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ-ক্রোড়ে" —সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

'যেমন' লুপ্ত।

(খ) "চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পীরিতি-ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ।" —চণ্ডীদাস

অনেক কাল পরে কৃষ্ণ-সমাগম হওয়ায় শ্রীরাধিকার চিত্তভাব বর্ণনা। 'যেন' বা 'যেমন' লুপ্ত।

সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

(ক) "সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশি তুল্য," ইত্যাদি।
—বঙ্কিমচন্দ্র

(খ) 'বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"
—জীবনানন্দ দাশ

এখানে অর্থ হয়তো এই,—চোখ পাখীর নীড়ের মত শান্ত, আরামদায়ক আশ্রয় ; চোখের রূপের বর্ণনা নয়, ভাবের বর্ণনা।

সাদৃশ্য-বাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত

(ক) "এ কি পাণ্ডুমুখ ? এ কি নয়ন-পল্লব
অশ্রু-অভিষিক্ত ? এ কি ? কেন মা ? .." —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এখানে 'নয়ন-পল্লব'-এর বিশেষণ 'অশ্রু-অভিষিক্ত' বলিয়া ব্যাস-বাক্য হইবে 'নয়ন পল্লবের ন্যায় মনোহর' ; অর্থাৎ সমাসটি উপমিত কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয় নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে উপমার দুইটি অঙ্গই লুপ্ত। উপমায় উপমেয়ের প্রাধান্য, রূপকে প্রাধান্য উপমানের।

(খ) "তাহার কাছে আমি কে ? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা," ইত্যাদি। —বঙ্কিমচন্দ্র

এখানে পূর্ণ বাক্যটি হইতেছে—"তাহার কাছে আমি সমুদ্রে শম্বুকের ন্যায় তুচ্ছ, কুসুমে কীটের ন্যায় কুৎসিত, চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় মলিন, চরণে রেণুকণার ন্যায় নগণ্য," ইত্যাদি।

সাদৃশ্য-বাচক শব্দ, সাধারণ ধর্ম ও উপমান লুপ্ত—

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন 'মৃগ-লোচনা' শব্দ 'মৃগের লোচনের ন্যায় চঞ্চল লোচন যার'—এই বহুব্রীহি সমাস দ্বারা একটি বিশিষ্ট নারী রূপ অন্য পদার্থকে বুঝাইতেছে। অতএব এখানে সাদৃশ্য-বাচক শব্দ, সাধারণ ধর্ম এবং উপমান এই তিনটিরই লোপ ঘটিয়াছে।[১] এই অভিমত সমর্থন-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, যে উপায়-দ্বারা একটি বিশিষ্ট নারী রূপ অন্য পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে, তাহাতে 'মৃগ' ও 'লোচন' এই শব্দ-দুইটির জ্ঞান এবং সাদৃশ্য-জ্ঞান আগেই সম্পন্ন হয়।

মহোপমা

যে উপমায় আক্ষিপ্ত উপমানের শক্তি ও সৌন্দর্য বিশদরূপে বিবৃত হওয়ার ফলে তাহা একটি প্রায় স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ চিত্রের আকার ধারণ করে, উপমার মহত্ব ও মহাকাব্যের উপযোগিত্ব-হেতু তাহার নাম **মহোপমা**।

গ্রীক মহাকবি হোমর কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ইউরোপে ইহার নাম **হোমরীয় উপমা** (Homeric Simile), এবং মহত্বপূর্ণ এপিক কাব্যই ইহার সমুচিত প্রয়োগক্ষেত্র বলিয়া ইহার অপর নাম **এপিক উপমা** (Epic Simile)। এখানে ইহার 'মহোপমা' নাম করা হইল। হোমরীয় উপমা গাম্ভীর্যে ও সৌন্দর্যে এবং বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে পূর্ণ হইলেও ইহা কালিদাসের উপমার অনেকটা বিপরীতধর্মী। কবি এখানে উপমেয়কে ত্যাগ করিয়া উপমানকে এরূপ সাজাইতে থাকেন, তৎসম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করেন যে, তাহা "স্বয়ং একটি সৌন্দর্যের নন্দন কানন হইয়া দাঁড়ায় ; পাঠক সে মুহূর্তে উপমেয়কে ভুলিয়া গিয়া উপমানের প্রতি বিস্মিত

১। "ত্রিলোপে চ সমাসগা।

যথা—রাজতে মৃগলোচনা, অত্র মৃগস্য লোচনে ইব চঞ্চলে লোচনে যস্যা ইতি সমাসে উপমাপ্রতিপাদক-সাধারণধর্মোপমানানাং লোপঃ।"

—সাহিত্যদর্পণ, ১০ম পরিচ্ছেদ

মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। পোপ বলেন,—"He makes no scruple to play with the circumstances."[১]

এইরূপ বর্ণনায় উহার স্বতন্ত্র সৌন্দর্য-হেতু কাব্যের মহত্ব বা মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং বর্ণনীয় বিষয়েও যে গুরুত্বের সঞ্চার হয়, তাহা অনস্বীকার্য।

উদাহরণ—

(ক) "কাঁদিলা মাধব-প্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।" —মেঘনাদবধ (৬ষ্ঠ সর্গ)

হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেও কখন কখন এই মহোপমার প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—

(খ) "দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতি-হীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু, জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মতো কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।"
—রবীন্দ্রনাথ (গান্ধারীর আবেদন)

মালোপমা

মালোপমা হইতেছে উপমার মালা।

যে উপমায় একই উপমেয়কে আশ্রয় করিয়া অনেক উপমান কখনও অভিন্ন কখনও বা বিভিন্ন সাধারণ ধর্ম লইয়া আক্ষিপ্ত হয়, এবং বিশিষ্ট সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, তাহার নাম **মালোপমা** অলঙ্কার।

উল্লিখিত সংজ্ঞায় সাধারণ ধর্মের অভিন্নতা ও বিভিন্নতা-অনুযায়ী উহার

১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রবন্ধ।

দুইটি ভেদ কথিত হইল। পূর্বেও মালোপমার অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এখানেও কয়েকটি নূতন উদাহরণ দেওয়া হইল,—

(১) সাধারণ ধর্ম অভিন্ন—

(ক) "পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ ;
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে ;
তরু যথা নবোদ্গত কিসলয়রাজি
বসন্ত-প্রারন্তে ধরে নীল পীতে সাজি ;
নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি'
ক্লান্ত পরাণীরে রাখে বক্ষঃস্থলে ধরি ;
শুকতারা ধরে যেন নিশান্তে যামিনী,
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃত্রসংহার (৫ম সর্গ)

নৈমিষারণ্যে ইন্দ্র-পত্নী শচী পুত্র জয়ন্তকে কোলে লইতেছেন। একই সাধারণ ধর্ম দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া পাঁচটি উপমান আসিয়া মালোপমা সৃষ্টি করিয়াছে।

(খ) "দেখি, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায় বিকটমূর্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ কদাকার সৈন্য আসিতেছে।"

—কাদম্বরী

(২) সাধারণ ধর্ম বিভিন্ন—

(ক) "একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতী,
একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি,
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে,
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা,
সেই মত নৃপগণে নাশিব কি শঙ্কা ?" —কাশীরাম দাস

লক্ষ্যবেধের পর কৃষ্ণার প্রতি অর্জুনের উক্তি। এখানেও চারিটি উপমার

মালা ; কিন্তু সাধারণ-ধর্ম দুই বা তিন প্রকার। সিংহের সহিত না পারা, সকল পক্ষী নাশ করা এবং লঙ্কা দগ্ধ করা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ধর্ম বলিতে হইবে।

(খ) "সভয় হইল আজি ভয়-শূন্য হিয়া !
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড হায়রে, গলিল।
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল !
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে।"

—মধুসূদন দত্ত, মেঘনাদবধ (৬ষ্ঠ সর্গ)

সহসা-ভীত মেঘনাদের বর্ণনা। চারিটি লুপ্তোপমার মালা। কিন্তু এখানে প্রত্যেকটি সাধারণ ধর্মই প্রণিধান-গম্য, অতএব বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবান্বিত ; এবং কোনও দুইটি সাধারণ ধর্ম এক নয়।

উৎপ্রেক্ষা

বর্ণনীয় বিষয়ে যদি উপমান অর্থাৎ আক্ষিপ্ত বস্তুর অভেদরূপে সংশয় ঘটে, এবং সংশয়ে যদি উপমানপক্ষই প্রবল হয়, তাহা হইলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

উৎপ্রেক্ষা বা উৎপ্রেক্ষণ শব্দের অর্থ—বিতর্ক, সংশয় বা সম্ভাবনা।

বর্ণনীয় উপমেয়ের শিথিলীকরণ এবং উপমানের দৃঢ়ীকরণই অভেদরূপে সংশয়ের মূল কথা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ এইরূপ সংশয়কে বলেন 'সম্ভাবনা' ; সম্ভাবনা শব্দটির প্রচলিত বাঙ্গালা অর্থ কিন্তু 'সম্ভবপরতা'। এখানে কেবল একপক্ষে—উপমানের পক্ষেই অভেদরূপে প্রবল সংশয় জন্মে। ইহাকে তাই বলে 'উৎকট এককোটিক সংশয়', অর্থাৎ সংশয়ে একপক্ষের প্রাধান্য বা প্রবলতা। 'কোটি' অর্থ—পক্ষ। পরে দেখা যাইবে,—সন্দেহ-অলঙ্কারে থাকে 'উভয়-কোটিক সংশয়', অর্থাৎ সংশয়ের পক্ষদ্বয়ের সমকক্ষতা, উপমেয় ও উপমান দুই পক্ষই সমান সংশয়।

'মুখ যেন চাঁদ।'

এখানে কেবলমাত্র চাঁদ-সম্বন্ধীয় অভেদের সংশয়। মুখ কার্যতঃ অপ্রধান। তাই অলঙ্কার উৎপ্রেক্ষা।

'মুখ? না চাঁদ?'

এখানে অর্থ—হয় মুখ, নয় চাঁদ। উভয় পক্ষেই সমান সংশয়, উভয়েরই সমান প্রাধান্য। তাই অলঙ্কার সন্দেহ।

উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি, ভ্রান্তিমান্ প্রভৃতি অলঙ্কারে সংশয়ের কোন প্রশ্নই নাই।

উপমা-অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের কেবলমাত্র সাদৃশ্য; উৎপ্রেক্ষায় সাদৃশ্যের ফলে অভেদের 'সম্ভাবনা' বা সংশয়-যুক্ত কল্পনা; রূপকে অতি প্রবল সাদৃশ্যের ফলে অভেদের আরোপ; অতিশয়োক্তিতে অভেদের সিদ্ধি এবং তাহারই চূড়ান্ত ফলে উপমেয়ের নিগরণ বা গিলিত ভাব অর্থাৎ তাহার অনুল্লেখ।

উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের পূর্ববর্তী হইতেছে উপমা-অলঙ্কার এবং পরবর্তী হইতেছে রূপক-অলঙ্কার।

'মুখ চাঁদের ন্যায়।'—উপমা।

মুখ যেন চাঁদ।—উৎপ্রেক্ষা।

'মুখ-চাঁদ।' (মুখচাঁদ হাসে না, জ্যোৎস্না ছড়ায়)—রূপক।

'চাঁদ' (যেমন—'চাঁদের হাট'—সুন্দর মুখের মেলা)—অতিশয়োক্তি।

উৎপ্রেক্ষা-জ্ঞাপক শব্দ হইতেছে,—যেন (জনু), বুঝি, প্রায়, মনে হয় প্রভৃতি। যেন বা প্রায় শব্দ কখন কখন উপমাও বুঝাইয়া থাকে। তাই উহাদের প্রয়োগ দেখিয়াই কোন্ অলঙ্কার নিঃসংশয়ে স্থির করা যায় না, বাক্যার্থে অভেদ-সম্ভাবনার ভাবটি স্পষ্ট কিনা লক্ষ্য করিতে হয়। সম্ভাবনার ভাবটি স্পষ্ট হইলে সম্ভাবনা-বাচক কোন শব্দ প্রযুক্ত না থাকিলেও উহা উহ্য বলিয়া ধরিয়া হইতে হয় এবং অলঙ্কারকে উৎপ্রেক্ষাই বলিতে হয়।

সম্ভাবনা-বাচক শব্দ প্রযুক্ত থাকিলে, তাহাকে বলে **বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা**, আর উহা উহ্য অর্থাৎ প্রতীয়মান থাকিলে তাহাকে বলে **প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা**। ইহাদের দ্বারা উৎপ্রেক্ষার কোন জাতিভেদ বুঝাইতেছে না, এই ভেদ একান্ত বাহিরের, সম্ভাবনার মূল ভাবটিই উৎপ্রেক্ষার একমাত্র লক্ষণ।

উদাহরণ—

(১) "রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ!" —মধুসূদন

এখানে অভেদের 'সম্ভাবনা' স্পষ্ট। 'তরুমূলে কুসুমরাশি পড়িয়া যাওয়া'—এই প্রকৃত বিষয়কে গৌণ করিয়া তৎসদৃশ ব্যাপারে 'অঙ্গের সাজ খুলিয়া ফেলা' এই আক্ষিপ্ত বস্তুকেই কল্পনা করা হইতেছে। এখানে উৎপ্রেক্ষা বাচ্য, বাচক শব্দ 'যেন'।

(২) "ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দন-সহিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন।" —কাদম্বরী

(৩) "হিমরেখা
নীলগিরিশ্রেণী 'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগ-মগ্ন ধূর্জটির তপোবন দ্বারে।" —রবীন্দ্রনাথ

(৪) "পূর্বদিকে আরক্তিম অরুণ প্রকাশে,
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে,
সারা নিশি গেল তাঁর নক্ষত্র সভায়,
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ শরমের দায়।" —রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিজেশ = চন্দ্র। এখানে উৎপ্রেক্ষা-জ্ঞাপক শব্দ 'বুঝি', ইহা তাই বাচ্য উৎপ্রেক্ষা।

(৫) "একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
আকুল জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে।
স্নেহময় সে চাহনি—সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।
দুরাশা তথাপি তারে গাঁট দিয়া দিয়া,
যতবার ছিঁড়ে যায়, যোড়া দেয় গিয়া। —গোবিন্দ দাস

চতুর্থ চরণের উৎপ্রেক্ষাটি বাচ্য। শেষ চরণের উৎপ্রেক্ষাটি

প্রতীয়মানা, 'যেন' উহ্য। দাঁড়ের আঘাতে নৌকা দূরে সরিয়া যাইতেছে, জননী আর ঠিকমত সাধ পূরাইয়া ছেলে অতুলকে দেখিতে পাইতেছেন না,—ইহাই যেন আঘাতে স্নেহবন্ধন ছিঁড়িয়া যাওয়া। আবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া জননী পুত্রকে দেখিতেছেন, ইহাই যেন গাঁট দিয়া জোড়া দেওয়া।

(৬) "চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল অলিভরে উলটায়॥"—বিদ্যাপতি

রাধার কাজল-পরা চঞ্চল চোখে বাঁকা দৃষ্টি। কবির বোধ হইতেছে যেন ইন্দীবর বা নীলপদ্মকে পবনে ঠেলিয়া লইতেছে, আর তাহার উপর ভ্রমর বসায় উহা উল্টাইয়া পড়িয়াছে।

(৭) "তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত-গৌরব
অনাদৃত, শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে, আয়ু-পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি' কটিদেশ
মৌন অপমানে।"
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রথমে ও শেষে দুইটি প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা। বসন কিংবা মেখলার অনাদর-বোধ কিংবা অপমান-বোধ সম্ভবপর নয়, কাজেই উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় লইতে হইতেছে। গদ্যে ব্যাখ্যানে লিখিতে হইবে—'যেন অনাদৃত', 'যেন অপমানে মৌন'। দ্রষ্টব্য—মধ্য বাক্যটিতে স্পষ্টতঃ 'যেন'-এর প্রয়োগ থাকিলেও অলঙ্কার উৎপ্রেক্ষা নয়, উপমা। ওখানে 'যেন' অর্থ 'যে প্রকার'; বাক্যার্থে অভেদের সম্ভাবনা কোথাও নাই, আছে একটি সাদৃশ্য-বোধ।

(৮) "অন্য পাশে বিশাল শিমূল
সবটুকু বক্ষোরক্ত নিঙাড়িয়া ফুটাইয়া ফুল
অর্ঘ্য দেয় দিবাকরে।"
—কালিদাস রায়

এখানে তিনটি প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সমগ্র বাক্যটি হইবে—অন্যপাশে বিশাল শিমূল যেন সবটুকু বক্ষোরক্ত নিঙাড়িয়া, যেন ফুটাইয়া ফুল, যেন অর্ঘ্য দেয় দিবাকরে!

মালা-উৎপ্রেক্ষা

একই উপমেয়কে অবলম্বন করিয়া যদি অনেক উপমানের অভেদের সম্ভাবনা ঘটে, তবে মালা-উৎপ্রেক্ষা হয়।

এই বই-এর ৭৫-৭৬-এর পৃষ্ঠায় মালা উৎপ্রেক্ষার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে। সেখানে চারিটি বাচ্য উৎপ্রেক্ষার মালা।

উৎপ্রেক্ষার মধ্যে বিতর্ক বা সংশয় থাকায় অনেক সময়ে অবাস্তব বা কাল্পনিক বস্তু আক্ষিপ্ত করিয়া উহাতে অভিনব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা হয়। এইজন্য উপমা হইতে উৎপ্রেক্ষায় কল্পনার খেলা অনেক বেশি থাকিতে পারে। উল্লিখিত ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮নং উদাহরণ লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। উৎপ্রেক্ষায় এই কল্পনার খেলার জন্যই ব্যক্তিত্ব-আরোপ বা Personification এবং মানব-হৃদয়ের তুল্য অনুভূতির (Pathetic Fallacy-র) সংশয়িত প্রকাশ দেখা যায়। উল্লিখিত ১ ও ৭নং উদাহরণে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারে উৎপ্রেক্ষণ বা কাল্পনিক ধর্মের সংশয়িত প্রকাশই প্রধান কথা।

রূপক

বর্ণনীয় বিষয়ে উপমান অর্থাৎ আক্ষিপ্ত বস্তুর অভেদ আরোপ করা হইলে রূপক অলঙ্কার হয়।

বলা বাহুল্য, এই অভেদ কাল্পনিক।

রূপক শব্দের অর্থ রূপবান, মূর্ত ; তাহা হইতে প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতিও হয়। এই অর্থ লক্ষ্য করিয়াই আলঙ্কারিকেরা বলেন রূপক হইতেছে রূপের আরোপ। এই আরোপে উপমেয়কে অস্বীকার করা হয় না ; তাহাকে স্বীকার করা হয়, কিন্তু অপ্রধান করিয়া আক্ষিপ্ত বস্তু বা উপমানকে প্রধান করা হয়। এই প্রাধান্য বুঝা যায় গুণ বা ক্রিয়ার বর্ণনা হইতে। রূপকালঙ্কারে একমাত্র উপমানেরই ধর্ম প্রকাশ পায়।

'মুখ নহে, চাঁদ।'

এখানে যে চাঁদের আরোপ হইল, তাহাতে মুখকে অস্বীকার করা হইয়াছে। অলঙ্কার তাই রূপক নহে।

'মুখ-চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়ায়।'

এখানে মুখ স্বীকৃত হইয়া আরোপের ফলে চাঁদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং একমাত্র চাঁদের ধর্মই বর্ণিত হইয়াছে। জ্যোৎস্না ছড়ান একমাত্র চাঁদেরই ধর্ম, মুখ শুধু হাসে। তাই অলঙ্কার এখানে রূপক।

রূপকের পূর্ববর্তী অলঙ্কার উপমা বা উৎপ্রেক্ষা, এবং পরবর্তী অলঙ্কার অতিশয়োক্তি বা রূপকাতিশয়োক্তি।

এই রূপক বা রূপের আরোপ নানা উপায়ে হইয়া থাকে ;—

(১) সাক্ষাৎ ভাবে রূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া, যথা—

ক্রোধ-রূপ অগ্নি সকলকেই দগ্ধ করে।

(২) রূপ শব্দ তুলিয়া দিয়া উপমেয় ও উপমান এই শব্দ দুইটির সমাস-বদ্ধ পদ প্রয়োগ করিয়া, যথা—

ক্রোধাগ্নি সকলকেই দগ্ধ করে।

এই সমাস রূপক কর্মধারয় সমাস, ব্যাস-বাক্য হইবে—ক্রোধ-রূপ অগ্নি।

দ্রষ্টব্য—রূপক কর্মধারয় সমাস ও উপমিত কর্মধারয় সমাসে ব্যাস-বাক্য ভিন্নরূপ হইলেও সমাসবদ্ধ পদটি দেখিতে একই প্রকার। এইরূপ স্থলে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ সমস্ত বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিয়া অলঙ্কার নির্ণয় করিতে হয়। যখন তাহাতেও নিঃসংশয় হওয়া যায় না, তখন বুঝিতে হইবে রূপক বা উপমা যে কোন অলঙ্কার হইতে পারে। ইহাকে বলে উপমা-রূপকের সঙ্কর।

'নয়ন-পল্লব শিশির-সিক্ত।'

এই বাক্যে 'নয়ন-পল্লব'-এ রূপক কর্মধারয় সমাস, অলঙ্কার রূপক। কারণ, বিশেষণ 'শিশির-সিক্ত' কেবল পল্লবের ধর্ম। নয়নের অনুরূপ বিশেষণ হইবে 'অশ্রু-সিক্ত', সেক্ষেত্রে বাক্য হইবে,—'নয়ন-পল্লব অশ্রু-সিক্ত।' এই বাক্যে 'নয়ন-পল্লব'-এ উপমিত কর্মধারয় সমাস, ব্যাস-বাক্য—নয়ন পল্লবের ন্যায়, এবং অলঙ্কার উপমা। [পৃঃ ৭৭, দ্বিতীয় (ক) দ্রষ্টব্য।]

বাক্যটি যদি হয়,—'নয়ন-পল্লব মনোহর',—তাহা হইলে সেখানে উপমা-রূপকের সঙ্কর হইবে; কারণ, মনোহর উভয়ক্ষেত্রেই বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে।

'মুখ-চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়ায়'—এই উদাহরণে পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, ক্রিয়াপদ দ্বারা রূপকটির উপলব্ধি হইতেছে।

উপমা-অলঙ্কারে উপমান ও উপমেয়ের কার্যতঃ সমান মূল্য, কিন্তু রূপকে মূল্য উপমানেরই। রূপের আরোপের ফলে রূপকে উপমেয়ের ধর্ম একেবারে আচ্ছন্ন হয়।

সমাস-বদ্ধ পদ দ্বারা রূপক গঠিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে সংস্কৃতে বলে **সমস্ত রূপক।**

সমাস-বদ্ধ রূপকপদের অপর উদাহরণ—

"যদি মোহ-গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য-খোঁটা ধ'রে রবি।" —রামপ্রসাদ

"ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ী।" —রামপ্রসাদ

(৩) অভেদ-সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ করিয়া; যথা—

(ক) "মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।" —রবীন্দ্রনাথ

(খ) "শোকের ঝড় বহিল সভাতে!" —মধুসূদন

(গ) "রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥" —জ্ঞানদাস

(ঘ) "বিদ্যার সাগর", 'বিদ্যার জ্যোতিঃ',
'বিদ্যার নিধি', 'বিদ্যার অরণ্য' প্রভৃতি।

সমাস-ভাঙ্গা পদ অর্থাৎ ব্যাসবাক্য দ্বারা গঠিত হওয়ায় ইহাদিগকে সংস্কৃতে বলে **ব্যস্ত রূপক**।

(৪) তাদাত্ম্যে 'ময়' প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিয়া, যথা—
অন্ধকারের পরপারে জ্ঞানময় সূর্যের উদয়।

(৫) উপমেয় ও উপমানকে পাশাপাশি রাখিয়া অভেদ ঘোষণা করিয়া—

(ক) "সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুল হার,
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার!" —রবীন্দ্রনাথ

(খ) "শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥" —বিদ্যাপতি

মূর্তি, ছবি, সাক্ষাৎ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াও রূপক সম্পন্ন করা হয়, অথবা বর্ণিত রূপকে শক্তিবৃদ্ধি করা হয়।

রূপকের পরিচয়-প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কবি বা লেখকগণ সকল সময়ে রূপকের অথবা যে কোন অলঙ্কারের বর্ণনায় নিয়মানুগ সমস্ত খুঁটিনাটি পালন করেন না, অনেক সময়ে তাহা করা সম্ভবপর বা সঙ্গতও হয় না। রূপকে অনেক সময়ে উপমেয় এবং ক্বচিৎ উপমানও উহ্য থাকে। আস্বাদন বা ব্যাখ্যানের সময় এই সমস্ত অঙ্গ যোজনা করিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে হয়।

উদাহরণ—

(ক) "নিঠুর গরজি, তুই মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহুনে?" —মদন বাউল

এখানে মানসরূপ মুকুল—এই রূপক দিয়া রচনা আরম্ভ। পরে 'আগুন', 'ফুল' এবং 'বাস' এই উপমানগুলির একতরফা উল্লেখে অভেদ-সর্বস্ব অতিশয়োক্তির লক্ষণই বড় বলিয়া মনে হইতেছে। এখানে কিন্তু অলঙ্কার রূপকই বলিতে হইবে, ব্যাখ্যানের সময় উপমেয় 'অধৈর্য', 'চিত্ত' ও 'ভক্তি'র উল্লেখ করা আবশ্যক; এইগুলি উহ্য রহিয়াছে।

(খ) "মনরে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥" —রামপ্রসাদ

এখানেও মানবরূপ জমিন—স্পষ্টতঃ এই একটি মাত্র রূপক। 'কৃষিকাজ', 'আবাদ', 'সোনা'—কেবল উপমান, তাই অতিশয়োক্তির কথা মনে হয়। 'পতিত' 'শ্লিষ্ট' দুইপক্ষেই অর্থ হইতে পারে। কিন্তু 'মনরে'—এখানে মাত্র উপমেয়ের উল্লেখ, 'কৃষক' বা 'চাষী' রূপ উপমান উহ্য। অলঙ্কার রূপকই বলিতে হইবে। এখানে সাধনা-রূপ কৃষি-কাজ, চিত্তের মলমার্জনা-রূপ আবাদ এবং ভক্তি বা জ্ঞান-রূপ সোনা উল্লেখ করিলে উপমানের উপলব্ধিতে ব্যাখ্যান স্পষ্ট হয়।

এই দুইটি রচনাই লোকাদৃত চমৎকার রচনা। অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী পূর্ণাঙ্গ করিয়া রচিত হইলে ইহা ভয়াবহ হইত।

(গ) "এমন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই।" —বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথম বাক্যে একটি মাত্র রূপক—সংসার রূপ সমুদ্র, পরে কেবল উপমানের অনুগত গুণ ও ক্রিয়ার বর্ণনা চলিয়াছে। পরবর্তী বাক্যটিতেও রূপক, মালা-রূপক; 'এ অরণ্যে' অর্থ—এই সংসার-রূপ অরণ্যে। এইরূপ পরেও দ্রষ্টব্য।

রূপক অলঙ্কারের কয়েকটি প্রকার-ভেদ আছে; যথা,—সাধারণ রূপক (নিরঙ্গ রূপক), সাঙ্গ রূপক, পরম্পরিত রূপক, বিশিষ্ট রূপক (অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক), আখ্যান-রূপক (Allegory) ইত্যাদি। রূপকের আধিকারিক প্রয়োগও আছে।

সাধারণ রূপক (নিরঙ্গ রূপক)

একটি উপমেয়ে একটি উপমানের অভেদ নির্দেশ হইলেই এই রূপক হয়।

(ক) "সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।" —নবীন সেন

(খ) "অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া বাজায় যে ওঙ্কার,—
ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে ভাবনার জটাভার,"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(গ) "জলেনি ত রুদ্ররোষানল,
তাই প্রেম ছিল স্নিগ্ধ, দাহহীন, প্রশান্ত শীতল।"

—কালিদাস রায়

মালা রূপক

একই উপমেয় বা বিষয় অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন উপমানের দ্বারা বিভিন্ন রূপের আরোপ হইলে মালা রূপক হয়। উদাহরণ—

(ক) "ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্ঘ রতন!" —মধুসূদন

এখানে তিনটি রূপকের মালা।

(খ) "হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥" —বিদ্যাপতি

এখানে ছয়টি রূপকের মালা।

(গ), (ঘ) পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় (ক), (খ) উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

সাঙ্গ রূপক

মূল উপমেয়ে উপমানের অভেদ-নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাদের অঙ্গগুলিরও যথাযথভাবে অভেদ-নির্দেশ হয়, তাহা হইলে সমগ্র অলঙ্কারটিকে সাঙ্গ রূপক অলঙ্কার বলা হয়।

এই রূপক পরস্পর-সম্বদ্ধ অনেক রূপকের মালা। সম্বন্ধ এখানে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ। 'সাঙ্গ' অর্থ—অঙ্গের সহিত বর্তমান। উদাহরণ—

(ক) "শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ; অশ্রু-বারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব !"
—মধুসূদন

মূল উপমেয় শোক, মূল উপমান ঝড়, ইহারা দুইটি অঙ্গী। শোকের অঙ্গ হইতেছে, বামাকুল (শোকের আধারস্বরূপ), মুক্তকেশ, ঘননিশ্বাস, অশ্রুবারিধারা, হাহাকার রব (এইগুলি শোকের প্রকাশচিহ্ন)। অপর পক্ষে ঝড়ের অঙ্গ হইতেছে—সুরসুন্দরী (বিদ্যুৎ), মেঘমালা, প্রলয়-বায়ু, আসার (ধারাবর্ষণ), জীমূতমন্দ্র (মেঘের গর্জন)। শোকের প্রত্যেকটি অঙ্গের সহিত ঝড়ের প্রত্যেকটি অঙ্গের যথাক্রমে অভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব সাঙ্গরূপক অলঙ্কার।

(খ) "হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্ত-প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি হবে বৃন্দা গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥

দাশরথি রায়ের প্রসিদ্ধ গান। মূল কথাটি হইতেছে হৃদয়-রূপ বৃন্দাবন। হৃদয় ও বৃন্দাবন এই দুইটি দুই পক্ষের অঙ্গী। অঙ্গগুলি হইতেছে যথাক্রমে :— উপমেয়-পক্ষে—ভক্তি, মুক্তি-কামনা, দেহ, স্নেহ ইত্যাদি। এবং উপমান-পক্ষে—রাধা, বৃন্দা, নন্দের পুরী, যশোমতী ইত্যাদি। অঙ্গসমেত অঙ্গী দুইটির চমৎকার অভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

(গ) ঐরূপ চমৎকার আর একটি উদাহরণ—বিদ্যাপতির 'আওল ঋতুপতি-রাজ বসন্ত' এই পদটি। বসন্ত সত্যই রাজা। কারণ—

"নৃপ-আসন নব পাটল পাত কাঞ্চনকুসুম ছত্র ধরি মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়। সমুখহিঁ কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র। আন দ্বিজকুল পঢ়ু আশিস মন্ত্র॥
—ইত্যাদি

উক্ত তিনটি উদাহরণই **সমস্ত বস্তুবিষয়ক সাঙ্গরূপকের** উদাহরণ। সাঙ্গরূপকে অঙ্গ ও অঙ্গী সম্বন্ধ-যুক্ত উপমান বা উপমেয়গুলির দুই একটি যদি

উল্লিখিত না থাকে, কিন্তু ভাবার্থে স্পষ্ট হয়, তবে তাহাকে বলে **একদেশ-বিবর্তী সাঙ্গরূপক**। ৮৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'মনরে কৃষিকাজ জান না' পদটিকে (মূলের সমগ্র পদটিকে) একদেশবিবর্তী সাঙ্গরূপকের একটি ভাল উদাহরণ বলিয়া স্বীকার করা যায়। উহাতে 'মনরূপ কৃষক' এই মূল রূপকের অঙ্গী উপমানই উহ্য রহিয়াছে। আবার অঙ্গী উপমেয়েরও অনেক অঙ্গের উল্লেখ নাই। কিন্তু অর্থ সর্বত্র স্পষ্ট, উহ্য অংশগুলি সহজেই বসান যায়।

পরম্পরিত রূপক

একই বাক্য-স্থিত একটি বস্তুতে রূপের আরোপ হওয়ার ফলে তৎ-সম্পর্কিত অন্য বস্তুতে যদি রূপের আরোপ ঘটে, তাহা হইলে রূপক-সমূহের পারম্পর্য-হেতু পরম্পরিত রূপক হয়। উদাহরণ—

(ক) "দিয়া হাস্য-সুধাচার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল।"
—শ্যামানন্দ দাস

কৃষ্ণ-রূপ ব্যাধ,—এখানেই মূল আরোপ। তাহারই ফলে পরম্পরাক্রমে কৃষ্ণের হাস্যসুধা হইল ব্যাধের চার, কৃষ্ণের অঙ্গছটা হইল ব্যাধের ব্যবহৃত আঠা, এবং আটকাইয়া পড়িল রাধিকার আঁখি-রূপ পাখী। আরম্ভে সাঙ্গরূপকের সম্ভাবনা মনে হইলেও, ইহা সাঙ্গরূপক নয়; কারণ, রাধিকার আঁখি কৃষ্ণের এবং পাখী ব্যাধের অঙ্গ নয়। অলঙ্কার পরম্পরিত রূপক।

(খ) "ভুবন-সায়রের হে মহাশতদল !
জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায়॥"
—সত্যেন্দ্রনাথ

ভুবনে সমুদ্রের আরোপ হওয়ায় বুদ্ধদেবে (উপমেয়, এখানে উহ্য) শতদলের এবং ভারতবর্ষে পদ্মের মৃণালের আরোপ হইয়াছে।*

(গ) "চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন-নেপথ্যের অভিনয় কর প্রযোজন।"
—বুদ্ধদেব বসু

---

* সংস্কৃত-সাহিত্যে কতকগুলি কবি-সময় বা কবি-প্রসিদ্ধি আছে। তদনুযায়ী অ-বাস্তবিক হইলেও কাব্যের জগতে সমুদ্রে ও নদীতে বিবিধ পদ্ম ফুটে, চকোর জ্যোৎস্না পান করে, বর্ষাকালে হংস-সমূহ মানস-সরোবরে যায়, সুন্দরীগণের পদাঘাতে অশোক ফুল এবং মুখমধুস্পর্শে বকুল ফুল ফুটিয়া থাকে—ইত্যাদি।
[সাহিত্য-দর্পণ, ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।]

চেতনায় নটমঞ্চের আরোপ হওয়ায় নিদ্রায় যবনিকার এবং অচেতনে নেপথ্যের আরোপ হইয়াছে।

(ঘ) "অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব সিন্ধু।" —গোবিন্দ দাস

(ঙ) "যখন হৃদয়াকাশ বিষম বিপত্তি-রূপ মেঘ দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল আশা-বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে।"
—অক্ষয়কুমার দত্ত

এখানে হৃদয়ে আকাশের আরোপ হওয়ায় বিপত্তিতে মেঘ এবং আশাতে বায়ুর অরোপ করা হইয়াছে।

(চ) "যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে, তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগ-তপ্ত বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে?"
—বঙ্কিমচন্দ্র (কমলাকান্তের দপ্তর, মনুষ্যফল)

বিশিষ্ট রূপক

(অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক)

রূপকে উপমেয়ে অভেদ আরোপের জন্য উপমানে যদি কোন বিশেষগুণ কল্পিত হয়, তবে তাহাকে বিশেষ-যুক্ত বা বিশিষ্ট রূপক অলঙ্কার বলে।

বলা বাহুল্য, এই কল্পিত গুণ এক অ-বাস্তব গুণ।

উপমানে একটি বৈশিষ্ট্য অধিক আরূঢ় হয় বলিয়া প্রাচীনেরা ইহার নাম করিয়াছেন অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক। এরূপ দীর্ঘ নাম-করণের কোন সার্থকতা নাই। উদাহরণ—

(ক) "এই মুখ সাক্ষাৎ কলঙ্ক-রহিত শশধর!
এই অধর সুধা-পূর্ণ পরিপক্ব বিম্বফল!
এই নেত্রযুগল অহোরাত্র-বিকসিত কুবলয়!
এই তনুখানি স্নানে সুখকর লাবণ্য-সাগর!"
—বিশ্বনাথ (সংস্কৃতের অনুবাদ)

এখানে গুণাধিক্য-যুক্ত উপমেয়গুলিতে অভেদ আরোপের জন্য উপমান-গুলিতে যথাক্রমে 'কলঙ্ক-রহিত', 'সুধাপূর্ণ', 'অহোরাত্র-বিকসিত' এবং 'স্নানে সুখকর' এই অ-বাস্তব বিশেষ গুণগুলি কল্পিত হইয়াছে। তাই অলঙ্কার বিশিষ্ট রূপক বা অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক।

এই প্রসঙ্গে ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রশ্ন উঠে না। কারণ, ব্যতিরেকে উপমেয় ও উপমানের একটির উৎকর্ষ ও অপরটির অপকর্ষ বর্ণিত হয়। এখানে কিন্তু উপমানকে বিশেষগুণ-যুক্ত করায় উভয়ের অভেদই নির্দেশিত হয়, আর তাহাই রূপকের আসল লক্ষণ।

(খ) "থীর বিজুরি বরণ গোরী
পেখলুঁ ঘাটের কূলে," —চণ্ডীদাস

(গ) "নাহি কালদেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি
তুমি অচপল দামিনী।" —রবীন্দ্রনাথ

আধিকারিক প্রয়োগ

কবিতায় বা যে কোন রচনায় একই রূপক সমগ্র বিষয়বস্তু অধিকার করিয়া প্রকাশ পাইলে, অর্থাৎ একই রূপকাশ্রয়ে সমস্ত রচনাটি সম্পন্ন হইলে রূপকালঙ্কারের অধিকারিক প্রয়োগ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। উদাহরণ—

(ক) সাঙ্গরূপকাশ্রিত রচনায় সর্বদাই রূপকের আধিকারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূর্বের উদাহরণগুলি দ্রষ্টব্য।

(খ) "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,

* * *

তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা॥" —রবীন্দ্রনাথ ('দুঃসময়')

এখানে 'বিহঙ্গ মোর' বলায় স্পষ্ট অর্থ—আমার জীবন-বিহঙ্গ, উপমেয়টি উহ্য রহিয়াছে। এই জীবন-বিহঙ্গ রূপকটি অবলম্বন করিয়াই বিহঙ্গের যাত্রা ও যাত্রাপথের মধ্য দিয়া রূপকটি সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। ইহাকে পরম্পরিত রূপক বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যায়। বর্ণনার প্রায় সর্বত্রই কেবল উপমানের

বর্ণনাই আছে। তথাপি অলঙ্কারটি রূপকই। রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' কবিতাটিও ('আজি মোর দ্রাক্ষা-কুঞ্জবনে') আধিকারিক রূপকের সুন্দর উদাহরণ।

আখ্যান-রূপকের অলোচনায় বুঝা যাইবে যে, তাহাতেও রূপকের আধিকারিক প্রয়োগ সম্পন্ন হয়।

আখ্যান-রূপক (Allegory)

গূঢ়ার্থ আখ্যান-ময় রূপকই আখ্যান-রূপক বা Allegory। ইহা প্রধানতঃ নীতি-মূলক হইয়া থাকে। ইহা মাত্র একটি রূপক নয়, ইহা পরস্পর-সম্বদ্ধ অনেক রূপকের সার্থক সমষ্টি বা সমাবেশ। ইহাতে আখ্যান-বস্তুর আখ্যান-হিসাবেও সরসতা চাই। কিন্তু ইহার তলে তলে আর একটি তাৎপর্য সমান্তর-ভাবে বহমান থাকিয়া প্রকৃত অর্থকে দ্যোতিত করে। ইহাতে তাই আখ্যানের ছদ্ম আবরণে বর্ণনীয় বস্তুর প্রকাশ হয়। কিন্তু ইহা পূর্ণাঙ্গ রূপক নয়, রূপকের প্রতিরূপ মাত্র। কারণ, ইহাতে কেবল আক্ষিপ্ত বস্তু বা উপমানেরই বর্ণনা থাকে, তাহাই হয় আখ্যান-বস্তু। প্রকৃত বস্তু বা উপমেয় থাকে আগা-গোড়া উহ্য। এই জন্যই ইহাকে গূঢ়ার্থ বলা হইয়াছে। বাঙ্গালায় নিখুঁত আখ্যান-রূপক সুলভ নহে। অনেক সময় লেখকগণ ইহার প্রারম্ভে, মধ্যভাগে বা অন্তে প্রকৃত অর্থের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ করিয়া থাকেন। সাহিত্য-বিচারে ইহা অনেক সময়ে ত্রুটি বা দোষ সন্দেহ নাই। উদাহরণ—

(ক) অক্ষয়কুমার দত্তের লিখিত 'স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক' ও 'স্বপ্নদর্শন—কীর্তি-বিষয়ক' নামক গদ্যনিবন্ধ অনেকটা এই জাতীয় রচনা।

(খ) রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন ও রক্তকরবী প্রভৃতি নাটক। প্রথম-খানিতে রক্ষণশীল প্রাচীন ভারতের অন্ধ সঙ্কীর্ণতা এবং দ্বিতীয়খানিতে গতিশীল ইউরোপের অন্ধ যান্ত্রিকতাকে রূপক বা আখ্যান-রূপকের সাহায্যে বিচিত্র করা হইয়াছে। এই রচনায় সাঙ্কেতিকতার সংমিশ্রণ থাকিলেও রূপকের প্রভাব অনস্বীকার্য।

সংস্কৃত ভাষার বিচার-চন্দ্রোদয় নাটক এবং ইংরাজী ভাষার Pilgrim's Progress আখ্যানরূপকের প্রসিদ্ধ উদাহরণ।

উপরূপক (Parable)

ধর্ম বা নীতিশিক্ষা-মূলক কিন্তু ব্যক্তার্থ আখ্যানময় রূপকই উপরূপক বা Parable। ইহা আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু রূপকের লক্ষণ আখ্যান-রূপক অপেক্ষা ইহাতে সমধিক পরিস্ফুট। পূর্বার্ধে কেবল উপমান বা আক্ষিপ্ত বস্তুর বর্ণনা থাকিলেও আখ্যানের শেষে ইহাতে উপমেয় বা বর্ণনীয় বস্তুর স্পষ্ট উল্লেখ থাকে এবং সমগ্র আখ্যানটির অর্থ বিশদ করা হয়। তাই ইহা ব্যক্তার্থ। ক্ষুদ্র রূপক ও প্রায় রূপক—এই অর্থে ইহার নাম করা হইল উপরূপক।

মহাভারতে এবং বাইবেলে অনেক সুন্দর সুন্দর উপরূপক আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশাবলীতে কয়েকটি চমৎকার উপরূপক দৃষ্ট হয়, তাহাদেরই একটি নিম্নে উদাহরণ-স্বরূপ দেওয়া হইল,—

"একটা লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিন জন ডাকাত এসে ধর্‌লে, তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোর ব'ললে, আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা ব'লে, খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো, তখন আর একজন চোর ব'ললে, না হে কেটে কি হবে? একে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত-পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে ব'ললে, আহা, তোমার কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই! তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি ব'ললে, আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে ব'ললে, এই রাস্তা ধরে যাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে। তখন লোকটি চোরকে বললে, 'মশাই আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্যন্ত যাবেন।' চোর ব'ললে, 'না আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিশে টের পাবে।"

"সংসারই অরণ্য, এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ ক'রতে যায়। রজোগুণ সংসারে বন্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণও আবার জীবের সংসার-বন্ধন মোচন করে।

কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যাওয়ার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ী ঐ দেখা যায়! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।"

—রামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ

কথা-রূপক (Fable)

ইহা একপ্রকার ছোট কাল্পনিক কথা বা গল্প। ইহাতে সাধারণতঃ মানব-প্রকৃতি আরোপ করিয়া পশুপক্ষীদের ব্যবহার ও কথোপকথনচ্ছলে নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

পশুপক্ষীর পরিবর্তে মানুষ থাকিলে, তাহা হয় কথা মাত্র, কথা-রূপক নহে, যেমন পঞ্চ-তন্ত্রের 'ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি' কথা।

সংস্কৃত সাহিত্যের পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এবং গ্রীক সাহিত্যের Æsop's Fables কথা-রূপকের ভাণ্ডার। হিতোপদেশ হইতে একটি কথা-রূপক নিম্নে তুলিয়া দেওয়া হইল :—

বুদ্ধি যাহার বল তাহার, বুদ্ধিহীনের বল কোথায়? দেখ, মদোন্মত্ত সিংহও শশক কর্তৃক নিপাতিত হইল।

মন্দর নামক পর্বতে দুর্দান্ত নামে এক সিংহ ছিল। সে সর্বদাই পশু বধ করিত। পশুগণ মিলিত হইয়া একদিন তাহাকে বলিল, "দেব! অকারণে সকল পশু বধ করিতেছেন কেন? যদি আপনি প্রসন্ন হ'ন তাহা হইলে আপনার আহারের জন্য আমরাই প্রত্যহ এক একটি পশু উপঢৌকন-স্বরূপ পাঠাইব।" সিংহ বলিল, "যদি তোমাদের এরূপ অভিমত হয়, তবে তাহাই হউক।" সেই দিন হইতে এক একটি পশু উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাহাই খাইয়া সিংহ জীবনধারণ করিতে লাগিল।

একবার একটি বৃদ্ধ শশকের পালা আসিল। সে ভাবিল,—বাঁচিবার আশায়ই লোকে ভয়ের বশে বিনয় দেখাইয়া থাকে। যদি মৃত্যুই নিশ্চিত হয়, তবে আর সিংহকে অনুনয় করিয়া লাভ কি?

শশকটি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সিংহ ছিল ক্ষুধা-পীড়িত, শশককে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কেন তুমি বিলম্বে আসিয়াছ?"

শশক বলিল, "দেব! আমার অপরাধ নাই। পথে আসিতে আসিতে

আর একটি সিংহ আমাকে বলপূর্বক ধরিয়া রাখিয়াছিল। আবার ফিরিয়া আসিব এই শপথ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিবার জন্য এখানে আসিলাম।" সিংহ কুপিত হইয়া বলিল, "শীঘ্রই আমাকে দেখাও কোথায় সেই দুরাত্মা বাস করে।"

তখন শশকটি সিংহকে লইয়া এক গভীর কূপের নিকট আসিল এবং 'মহারাজ! নিজেই দেখুন'—এই বলিয়া কূপজলে সেই সিংহটিরই প্রতিবিম্ব দেখাইল। তখন ক্রোধে ফুলিয়া দর্প করিতে করিতে ঐ প্রতিবিম্বের উপর সিংহটি ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। (সংস্কৃতের অনুবাদ)

পরিণাম

পরিণাম অলঙ্কারটিকে সংস্কৃতেও মম্মটভট্ট স্বীকার করেন নাই। বিশ্বনাথ প্রভৃতি যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনায় রূপক খানিকটা শক্তিহীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালায় এ অলঙ্কারের উদাহরণ দুর্লভ বলিয়া ইহাকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

অতিশয়োক্তি

বর্ণনীয় বস্তু ও আরোপ্যমাণ বস্তুর অভেদ সিদ্ধ হওয়ার ফলে বর্ণনীয় বস্তুর একেবারে গ্রাস বা লোপ হইলে, অথবা উহার বর্ণনা কল্পনাশ্রয়ে যে-কোন প্রকারে লৌকিক সীমা অতিক্রম করিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

প্রথম প্রকার অতিশয়োক্তি ভেদে অভেদ। ইহা অতিশয়োক্তির শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া এবং রূপকালঙ্কারের সাক্ষাৎ পরিণতি বলিয়া, বিশেষতঃ মম্মটভট্ট ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি অলঙ্কারাচার্যগণ অতিশয়োক্তিবিচারে কার্যতঃ ইহারই সংজ্ঞা নির্দেশ করায় বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়া ইহার লক্ষণ প্রথমে উল্লেখ করা হইল। বস্তুতঃ ইহাও দ্বিতীয় প্রকার অতিশয়োক্তির অন্তর্গত, তাহারই প্রধান ভেদ। দ্বিতীয় প্রকারের অতিশয়োক্তিই মূল অতিশয়োক্তি। প্রথম প্রকার অতিশয়োক্তি অতিশয়োক্তির বিশিষ্ট ভেদ বলিয়া তাহার পৃথক্ নামকরণ হইল রূপকাতিশয়োক্তি।

অতিশয়োক্তির সংজ্ঞাটির প্রথমার্ধ মম্মটভট্ট ও বিশ্বনাথের সংজ্ঞানুযায়ী[১]; দ্বিতীয়ার্ধ প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডীর অনুযায়ী[২], অগ্নি-পুরাণেও ঐ একই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।[৩] ইংরাজী Hyperbole-এর সংজ্ঞাও অনুরূপ তবে, উহার মধ্যে অতিশয়োক্তি ছাড়া ব্যতিরেক প্রভৃতিও পড়ে।

সৌন্দর্য স্বষ্টির উদ্দেশ্যে আতিশয্য-পূর্ণ উক্তি করা হয় বলিয়া উহার নাম অতিশয়োক্তি। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন, কেবল সৌন্দর্য নয়, সত্যের অনুরোধেও কিছু পরিমাণ অতিশয়োক্তির আবশ্যকতা হয়,—

"নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।......দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখান আবশ্যক। সেটুকু বড় সত্যের অনুরোধেই করিতে হয়; নহিলে জিনিষটা যে পরিমাণে ছোট দেখায়, সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড় করিয়াই তাহাকে সত্য করিতে হয়।......"

দণ্ডী অতিশয়োক্তিকে বলেন 'অলঙ্কারোত্তম' এবং 'অন্য অলঙ্কার-সমূহের একমাত্র আশ্রয়', আনন্দবর্ধন বলেন 'সর্বালঙ্কাররূপ', অভিনবগুপ্ত প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন 'সর্বালঙ্কার-সামান্যরূপ', মম্মট ভট্ট বলেন উহা 'সকল অলঙ্কারের প্রাণ-স্বরূপ'। বস্তুর যথাভূত বা যথাস্থিত রূপ শব্দে সমর্পিত হইলেই কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তির মিশ্রণ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ অলঙ্কারেই ব্যঞ্জনার ন্যায় অতিশয়োক্তি থাকে। কিন্তু অলঙ্কারিকগণ যে অতিশয়োক্তির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অনেক সময় আতিশয্যপূর্ণ বর্ণনা।

---

(১) "নিগীর্য্যাধ্যবসানং তু প্রকৃতস্য পরেণ যৎ।" —কাব্যপ্রকাশ, ১০।১০০
"সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তি নিগদ্যতে।" —সাহিত্য-দর্পণ, ১০।১৪
[ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইয়াছে]

(২) "বিবক্ষা বা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্তিনী।
অসাবতিশয়োক্তিঃ স্যাদ্ অলঙ্কারোত্তমা যথা।" —কাব্যাদর্শ, ২।২১৪

(৩) লোকসীমানিবৃত্তস্য বস্তুধর্মস্য কীর্তনম্।
ভবেদ্ অতিশয়ো নাম সম্ভবাসম্ভবা দ্বিধা॥" —অগ্নিপুরাণ. ৩৪৪।২৫

অতিশয়োক্তি—প্রথম প্রকার

রূপকাতিশয়োক্তি

রূপকাশ্রিত এবং রূপকেরই পরিণত রূপ বলিয়া ইহার নাম **রূপকাতিশয়োক্তি।** *

উপমেয় ও উপমানের মধ্যে ভেদ-সত্ত্বেও অভেদ সিদ্ধ হওয়ায় এবং উপমান উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করিয়া তাহার স্থান অধিকার করায় অতিশয়োক্তি ঘটিয়া থাকে। রূপক অলঙ্কার অভেদ-প্রধান, কিন্তু অতিশয়োক্তি অভেদ-সর্বস্ব। উপমান-কর্তৃক উপমেয়ের এই গ্রাসকে আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন 'সিদ্ধ অধ্যবসায়' বা 'অধ্যবসান'। উপমেয়ের অপলাপ বা অধঃকরণ করিয়া তাহার সহিত উপমানের অভেদ-প্রতীতিকে অধ্যবসায় বলে। এই অধ্যবসায় অনিশ্চিতরূপে কথিত হইলে তাহাকে বলে সাধ্য, উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে সাধ্য অধ্যবসায়। উহা নিশ্চিতরূপে প্রতিভাত হইলে তাহাকে বলে সিদ্ধ অধ্যবসায়। সেইজন্য বিশ্বনাথ অলঙ্কারটির সংজ্ঞা করিয়াছেন—

'অধ্যবসায় সিদ্ধ হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।'

—সাহিত্যদর্পণ, ১০।১৪

এই রূপকাতিশয়োক্তির পূর্বের অলঙ্কার রূপক এবং পরবর্তী অলঙ্কার ব্যতিরেক।

'মুখ-চাঁদ।'—রূপক।
'চাঁদ।' (যথা—চাঁদের হাট)—**অতিশয়োক্তি।**
'মুখের কাছে চাঁদ তুচ্ছ' বা 'চাঁদ জিনি মুখ।'—ব্যতিরেক।

উদাহরণ—

(১) "দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে॥"

'শুনিবার ইচ্ছা' এবং 'মধুর বাক্য বলা' এই দুই উপমেয়কে গ্রাস করিয়া উপমান 'তৃষা' ও 'সুধাবরিষণ' প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২) "উগরে নির্ঝর রচয় মুকুতানিকর।"

—রঙ্গলাল

* অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার কুবলয়ানন্দ কারিকায় অতিশয়োক্তির যে সাত প্রকার ভেদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভেদের নাম দিয়াছেন রূপকাতিশয়োক্তি ইহা ভেদে অভেদ রূপ।

এ স্থলে জলকণাগুলিই মুক্তা। তাহাদের উল্লেখ না করিয়া একেবারেই উপমান 'মুকুতা' দ্বারা উপমেয়ের নির্দেশ করা হইয়াছে।

(৩) "সকলে কাঁদি বলে—দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে ;" —রবীন্দ্রনাথ

'রাহু' এখানে কাশীরাজ এবং 'চাঁদ' কোশল-নৃপতি।

(৪) "সত্য মিথ্যা বাক্যে ধর্ম আপনে প্রমাণ।
তিন দিবসের চাঁদ দেখি বিদ্যমান ॥" —মুকুন্দরাম
"বিস্মিত হইলা কুড্যা দেখিয়া উজ্জ্বল,
কত কত ইন্দু শোভে গগনমণ্ডল।" —মুকুন্দরাম

ফুল্লরা চণ্ডীকে ঘরে দেখিয়া আসিয়াছে, তাঁহার বর্ণনা দিতেছে—সাক্ষাৎ তিন দিবসের চাঁদ। এখানে স্পষ্ট রূপকাতিশয়োক্তি। কিন্তু কালকেতু ও ফুল্লরা কুটীরে গিয়া যাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল, তাহার বর্ণনায় মুখ্যতঃ দ্বিতীয় প্রকার অতিশয়োক্তি।

(৫) "মালতি সফল জীবন তোর।
তোরে বিরহে ভুবন ভ্রময়ে ভেল মধুকর ভোর।
জাতকী কেতকী কতনা আছএ সবহি রস সমান।
স্বপনেহু নহি তাহি নিহারয় মধু কি করত পান।" —বিদ্যাপতি

(৬) "রেবতী তখন অন্যদের অভাজন ব'লেই মনে করে, ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশী, শাঁসটা পেলনা।" —রবীন্দ্রনাথ

(৭) "যে মন রস সম্ভোগ করে সে যাতায়াত সুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েচে সেই দিকটাতে যে-দিকে চলেছে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণ-শালা'—আধুনিক গল্পকবিতানাটকময় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য।

মদ—যৌনবাসনা-বিক্ষুব্ধ উগ্র উত্তেজক কিন্তু আপাত-মধুর রস-সাহিত্য।

উল্লিখিত উদাহরণ-সমূহ হইতে বুঝা যাইবে গদ্যেও পদ্যের ন্যায় এই রূপকাতিশয়োক্তির সমান উল্লাস দেখা যায়। আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় এবং প্রচলিত প্রবাদ-সমূহেও অতিশয়োক্তির ছড়াছড়ি ; যথা—

(১) ক্রুদ্ধ হইয়া বলি—'গাধাটা কিছুই বোঝে না', 'শয়তানটাকে ধরে নিয়ে এস', 'উল্লুক কোথাকার', 'জানোয়ারটাকে তাড়িয়ে দাও' প্রভৃতি।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রূপকাতিশয়োক্তির প্রয়োগ হইয়াছে।

(২) 'এক ঢিলে দুই পাখী মারলাম'; 'এতো বেশ! রথ দেখাও হ'ল, কলা বেচাও হ'ল'; 'যাও যাও, নিজের চরকায় তেল দাও'; 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা'; 'পাতের কুকুর নাই পেলে মাথায় উঠে'; 'দেখ, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজেনা, কাজও চাই'; 'সাবধান করে দিচ্ছি আগুন নিয়ে খেলা করোনা'; 'তারের খবর পেয়ে মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল'; 'আঁতে ঘা পড়েছে, এবার শিক্ষা হবে মনে হয়'; ছেলেটা ইঁচোড়ে পেকে গেল'; 'থামো, আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিওনা'; 'তিলকে তাল করা তোমার স্বভাব, বিশ্বাস করিনা তোমার কথা'; 'কিহে খাল কেটে কুমীর আনলে'; 'দুনৌকায় পা দিও না'; 'হালে পানি পাই না' প্রভৃতি।

উল্লিখিত বাক্য-সমূহের মধ্যে প্রবাদ-বাক্যেরও প্রয়োগ রহিয়াছে, রীতিসিদ্ধ পদেরও প্রয়োগ রহিয়াছে। অনেক রীতিসিদ্ধ পদই এই রূপকাতিশয়োক্তির অবলম্বনে রচিত। রচনায় রূপ সৃষ্টি করিয়া চিত্র-ধর্মের সঞ্চার করিতে হইলে. অথবা মিতভাষণ দ্বারা স্বল্প প্রয়াসে অর্থের সাক্ষাৎকার ঘটাইতে হইলে, এই অতিশয়োক্তির কুশল প্রয়োগ চাই।

'মুখ দ্বিতীয় চন্দ্র'—এইরূপ বাক্যেও কেহ কেহ এই অতিশয়োক্তি উপলব্ধি করেন। কারণ, ইহাতে মুখের অধঃকরণ করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রতীতি হইতেছে। বিষয় বা উপমেয়ের উল্লেখ থাকায়ও তাঁহাদের মতে দোষ হয় নাই, সমর্থনে তাঁহারা একটি বচন উদ্ধৃত করেন, যথা—

"বিষয় বা উপমেয়—শব্দদ্বারা অ-গৃহীত হউক বা গৃহীত হউক, অধঃকরণ হইলেই তাহার নিগরণ বা গ্রাস হইয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ মন্তব্য করেন…"[১]

এই ব্যাখ্যানুসারে—

(১) "কুমার বাসর-জয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর।"

---

১ "বিষয়স্যানুপাদানেঽপ্যুপাদানেঽপি সূরয়ঃ।
অধঃকরণমাত্রেণ নিগীর্ণত্বং প্রচক্ষতে॥" —সাহিত্যদর্পণ, ১০।১৪

অথবা, (২) "সই পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরম কথা॥" —চণ্ডীদাস

—প্রভৃতি স্থলেও রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

সাহিত্যদর্পণ-কার এই সংজ্ঞা অনুসরণ করিয়াই অতিশয়োক্তির ভেদে অভেদ ছাড়া আরও চারটি ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং কার্যকারণের পৌর্বাপর্যের ব্যতিক্রম। পূর্ববর্তী মম্মটভট্ট অতিরিক্ত দুইটি ভেদের এবং পরবর্তী অপ্পয়দীক্ষিত অতিরিক্ত ছয়টি ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ যে শ্লোকগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ধরা-বাঁধা একঘেয়ে রকমের। বিষয়ের নিগরণ অতি কষ্ট কল্পনা করিয়া বুঝিতে হয়; বিষয় বিষয়ী বা উপমেয় উপমানও অনেক সময়ে বুদ্ধিগোচর হইতে চায় না। আর এই প্রকারগুলি ছাড়াও অন্য প্রকারের অতিশয়োক্তি আধুনিক সাহিত্যে দেখা যায়। অবশ্য অসম্বন্ধে সম্বন্ধ বা সম্বন্ধে অসম্বন্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা-চাতুর্যে অনেক প্রকারই হয়তো উহাদের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সহৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। সহজ উপলব্ধি ও সহজ আলোচনার জন্য আচার্য দণ্ডীর বিখ্যাত সংজ্ঞাটির অন্তর্গত করিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে অন্য সকল প্রকার অতিশয়োক্তি প্রদর্শিত হইল।

অতিশয়োক্তি (দ্বিতীয় প্রকার)

ইহার সংজ্ঞা পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য বর্ণনীয় বিষয়ের অত্যধিক উৎকর্ষপূর্ণ উক্তিই অতিশয়োক্তি। 'অতিশয় উৎকর্ষ, তাহার উক্তি অতিশয়োক্তি'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কাব্যাদর্শনের টীকাকার প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ।

অতিশয় উৎকর্ষ-পূর্ণ উক্তি হইয়াও অন্য অলঙ্কারের প্রবল সম্ভাব থাকিলে অতিশয়োক্তি না বলাই সঙ্গত।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সাহিত্যদর্পণ-কারের মতে অতিশয়োক্তি পাঁচ প্রকার। ভেদে অভেদ রূপ প্রথম প্রকার অতিশয়োক্তি, আমাদের মতে রূপকাতিশয়োক্তি। অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং

কার্যকারণের পৌর্বাপর্যব্যতিক্রম-রূপ অন্য চারি প্রকার অতিশয়োক্তির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) "অবশ্য ইহার বটে নির্মাণ-চাতুরী।
স্বতন্ত্র প্রকার কিবা শোভার মাধুরী ॥" —নিবাতকবচ বধ

এখানে স্বতন্ত্র প্রকার শোভার মাধুরী বলাতে অভেদে ভেদ-রূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে বলা যায়।

(২) "নির্মাইতে এই অঙ্গ চন্দ্র সুকুমার
বিধি হয়েছিল, কিংবা সাক্ষাৎ মদন,
অথবা বসন্তকাল ; নতুবা বিধাতা
বেদাভ্যাস-জড় হয়ে করিলা সৃজন
কেমনে এ নারীমূর্তি ত্রিলোকনন্দন !"—(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

এখানে নির্মাণ-বিষয়ে বিধাতার সম্বন্ধ থাকিলেও অসম্বন্ধ জ্ঞাপন করায় সম্বন্ধে অসম্বন্ধ-রূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে বলা যায়।

(৩) "ইন্দুর মণ্ডলে যদি ফুটে দুই ইন্দীবর,
হেরি তবে চারু-নেত্র মুখ সেই মনোহর।"—(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

এখানে ইন্দুমণ্ডলে নীলপদ্ম ফোটারূপ সম্বন্ধ না থাকিলেও 'যদি' শব্দবলে উহার আরোপ হইতেছে, অতএব অসম্বন্ধে সম্বন্ধ-রূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। অপর উদাহরণ—

"দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইল লুকাইয়া ॥"—ভারতচন্দ্র (বিদ্যার রূপবর্ণনা)

এখানে বিদ্যার মুখে সুধার সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও উহা খ্যাপন করায় অসম্বন্ধে সম্বন্ধ-রূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে বলা যায়।

(৪) 'দৃষ্টি হেথা পড়িতে না পড়িতে তোমার,
আগেই হইল দেখি বিস্ময়ে প্রস্কার !" —নিবাতকবচ বধ

এখানে কারণের পূর্বে কার্যোৎপত্তি হওয়ায় কার্যকারণের পৌর্বাপর্যের ব্যতিক্রম-রূপ অতিশয়োক্তি হইয়াছে বলা যায়।

(৫) "সম্ভব হইবে লুপ্ত শারদচন্দ্রিমা,
অসম্ভব হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা।" —নবীনচন্দ্র সেন

এখানে প্রকৃতি-বিপর্যাসের উল্লেখ-হেতু অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

(৬) "সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভোনক্ষত্রমণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল।
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হইলেও তবু নাহি পরিত্রাণ॥" —নবীনচন্দ্র সেন

এখানে অসম্ভব কার্যের উল্লেখ-হেতু অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

(৭) "জেন স্থির, যদি কভু রবি শশী খসে,
সাগরে না রহে জল, অনল শীতল,
মেরু যদি নড়ে, বিশৃঙ্খল ব্রহ্মাণ্ড যদ্যপি,
পাণ্ডব না আশ্রিতে ত্যজিবে।" —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

এখানেও প্রকৃতি-বিপর্যাসের উল্লেখ-হেতু অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

(৮) "এমন পিরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।" —চণ্ডীদাস

এখানে অভেদে ভেদ বা সম্বন্ধে অসম্বন্ধ-হেতু অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

(৯) "হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব,
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥" —বিদ্যাপতি

এখানে সিন্ধুর তৃষ্ণানিবারণ-শক্তির অভাব, চন্দনতরুর সৌরভত্যাগ,

শশধরের অগ্নি-বর্ষণ, চিন্তামণির নিজ ধর্ম-ত্যাগ, শ্রাবণমাসে বর্ষণের অভাব প্রকৃতির বিপর্যাস বুঝায়।

এইগুলি অসম্ভব কার্যও বটে। অলঙ্কার তাই অতিশয়োক্তি।

(১০) "ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥"

—ভারতচন্দ্র (অন্নদার মোহিনীরূপ)

এখানে ফুলধনুর কটি-মধ্যে লুকান, শশাঙ্কের পদনখে থাকা এবং কোকিল-কোকিলার অন্নদার চারিপাশে উড়া সকলই অসম্বন্ধে সম্বন্ধ। অতএব অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

সাহিত্য-রচনায় অতিশয়োক্তির মূল্য কি, পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভাবাবেগ সঞ্চার করায় এবং বিষয়টি সুস্পষ্ট করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ গোচর করায় অতিশয়োক্তির সার্থকতা। আধুনিক সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির জন্যও ইহার কুশল প্রয়োগ হইয়া থাকে। আমাদের চরিত্রে ও সাহিত্যে আতিশয্য বা অতিরঞ্জন হাস্যরসের এক বড় উপাদান। এমন কি অনুপ্রাস, যমক বা উপমা অলঙ্কার অবিচ্ছেদে প্রযুক্ত হইতে থাকিলে হাস্যের উদ্রেক করিয়া থাকে।

আমাদের অতিশয়োক্তি ইংরাজী Hyperbole, কিন্তু ইংরাজী Hyperbole মাত্রই আমাদের অতিশয়োক্তি নহে; অনেক সময় তাহা আমাদের ব্যতিরেক অলঙ্কার, অথবা উপমা অলঙ্কার। যথা—

"They were swifter than eagles,
They were stronger than lions" —David

এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কার।

আবার—

"I saw their chief tall as a rock of ice; his spear, the blasted fir; his shield, the rising moon; he sat on the shore like a cloud of mist on the hill."

— Ossian

এখানে মূল অলঙ্কার উপমা।

ব্যতিরেক

উপমান অর্থাৎ আক্ষিপ্ত বস্তু অপেক্ষা বর্ণনীয় বস্তুর উৎকর্ষ বর্ণিত হইলে, অথবা কখন কখন বর্ণনীয় বস্তুর অপকর্ষ বর্ণিত হইলে, ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

ব্যতিরেক অলঙ্কার তাই দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ব্যতিরেক অলঙ্কার, যাহাতে আকৃষ্ট উপমানকে নিন্দিত বা নিকৃষ্ট বলিয়া উপমেয় বস্তুর অনুপম স্বতন্ত্র মর্যাদা স্থাপন করা হয়, তাহাই প্রধান ব্যতিরেক। সাহিত্যে ইহারই প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। রূপকে অভেদের আরোপ, অতিশয়োক্তিতে অভেদের সিদ্ধি, ব্যতিরেকে পুনরায় ভেদ, কিন্তু এই ভেদ-কথনই উপমেয়-বস্তুর সর্বাতিশয়ী সৌন্দর্য বা মহিমা ঘোষণা করে। এই অলঙ্কারের তুলনায় রূপকও যেন বাহ্য। প্রথম প্রকার অতিশয়োক্তির সহিত ইহার সারূপ্য এত পরিস্ফুট যে, ইহাকে ব্যতিরেক না বলিয়া **বিশেষ অতিশয়োক্তি** বলিলে যেন আরও সার্থক নাম হয়।

'মুখচাঁদ'—রূপক। 'চাঁদ'—অতিশয়োক্তি।

'চাঁদ গঞ্জি বা চাঁদ নিন্দি মুখ'—ব্যতিরেক।

ব্যতিরেক শব্দের অর্থ—পৃথক্ করণ বা ভেদ।

যাহাতে বর্ণনীয় বস্তুর অপকর্ষই স্থাপিত হয়, তাহা দ্বিতীয় প্রকার ব্যতিরেক। সাহিত্যে ইহার বিরল এবং চমৎকারিত্বও বেশি নহে। তাই ইহা পৃথক্ করিয়া দেখান হইল।

উপমেয়ের এই উৎকর্ষ বা অপকর্ষের হেতু কখন উক্ত কখন বা অনুক্ত থাকে। অনুক্ত থাকিলেও নানা প্রকারে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

প্রথম প্রকার ব্যতিরেক (উপমেয়ের উৎকর্ষ)

এইপ্রকার ব্যতিরেক-জ্ঞাপক শব্দ 'জিনি', 'নিন্দি' বা 'নিন্দিত', 'গঞ্জি', 'ছার', 'গর্ব-বিমোচন' প্রভৃতি। ইহাদের প্রয়োগে সাধারণতঃ অপকর্ষের হেতু উল্লিখিত হয় না, সাক্ষাৎ ভাবেই উহা জানান হয়। ইহাদের প্রয়োগ না হইলেই নানা প্রকার বাচন-ভঙ্গী আসে, তাহাতে হেতু সাধারণতঃ উক্ত হয়

এবং দুই-এর সাদৃশ্য সত্ত্বেও উপমেয়ের উৎকর্ষ জানাইয়া তুলনা অসম্ভব বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

উদাহরণ—

(১) "গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতি পাঁতি জিনিয়া দশন ॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাটা
কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।" —মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(২) 'বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর', নবনী-নিন্দিত বাহুপাশ', 'রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ', 'অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিলরে', 'মুখছটা জিনি ইন্দু', 'বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে', 'কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে', 'কি ছার ইহার কাছে হে দানবপতি ময়, মণিময় সভা'—প্রভৃতি উক্তি।

শেষ দুইটি উক্তিতে চকোর চাঁদ তুচ্ছ হইয়াছে রাধাকৃষ্ণের কাছে এবং ময়-নির্মিত সভা তুচ্ছ হইয়াছে মধুসূদন-বর্ণিত রাবণের সভার কাছে।

(৩) "অঞ্জন-গঞ্জন জগজন-রঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।
দেখ সখি নাগর-রাজ বিরাজে।
শুধুই সুধাময় হাস বিকাশিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥
ইন্দীবর-বর- গরব-বিমোচন
লোচন মনমথ ফান্দে।" —গোবিন্দ দাস

এখানে চারিটি ব্যতিরেক চারি প্রকারে জ্ঞাপিত হইয়াছে—(১) 'গঞ্জন' (২) 'জিনি' (৩) 'মলিন ভেল' (৪) 'গরববিমোচন'—এই চারিটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ করিয়া।

(৪) "বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী ;
ততোঽধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে।" —শাক্ত পদাবলী

এখানে বাচনভঙ্গী দ্বারা ব্যতিরেক বুঝান হইয়াছে এবং হেতু পূর্ব বাক্যার্ধে উক্ত হইয়াছে। অর্থ হইল—মণি ছাড়িয়া ফণী হয়তো ক্ষণকাল বাঁচিতে পারে, কিন্তু উমাকে ছাড়িয়া শূলপাণি তিলার্ধকালও থাকিতে পারেন না।

(৫) "ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এককণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর অপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।" —চণ্ডীদাস

রাধাকৃষ্ণ উপমেয় ; ভানুকমল, চাতকজলদ, কুসুমমধুপ এবং চকোরচাঁদ উপমান। হেতু উল্লেখ করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অতুলনীয়ত্ব অর্থাৎ উপমেয়ের অধিক উৎকর্ষ খ্যাপন করা হইয়াছে। একটি মাত্র উপমেয় এবং অনেক উপমান থাকায় **মালা-ব্যতিরেক** অলঙ্কার হইয়াছে বলা যায়।

(৬) "চন্দ্র সবে ষোল কলা হ্রাসবৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিলে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র-হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥" —ভারতচন্দ্র

কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণনের প্রারম্ভে কবি তাঁহার অতুলনীয়ত্ব খ্যাপন করিতেছেন। ভূতলের কৃষ্ণচন্দ্র ও আকাশের শুভ্রচন্দ্রের সর্বাংশে তুলনা করিয়া শুভ্রচন্দ্রকে দুয়ো দেওয়া হইয়াছে। হেতুগুলিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কার যমককে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইয়াছে। কলা—অংশ, বিদ্যার প্রকার ; পদ্মিনী—পদ্ম, সুলক্ষণা নারী; কালী—কালোবর্ণ, মহাশক্তি, পক্ষ—মাসার্ধ, পত্নী !

(৭) "শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জন ;
সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদ, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে, কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে

এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!" —মধুসূদন

এখানে দুইটি ব্যতিরেক। মেঘের গর্জন, সিংহনাদ, জলধির কল্লোলকে পরাভূত করিয়া উঠিয়াছে কোদণ্ড টঙ্কার। মালা-ব্যতিরেক। ইরম্মদের গতিকে তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়াছে শর, ভয়ঙ্কর। অপর ব্যতিরেক।

দ্বিতীয় প্রকার ব্যতিরেক (উপমেয়ের অপকর্ষ)

উদাহরণ—

"দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর,
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু ক্রমশঃ হইলে তনু
আর ত নূতন নাহি হয়॥" —হরিশচন্দ্র কবিরত্ন

এখানে উপমেয়—নরের তনু, উপমান—শশধর। তুলনায় তনুর অপকর্ষ ও শশধরের উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। অতএব ইহাও ব্যতিরেক। কারণ এখানে উক্ত হইয়াছে।

এই জাতীয় ব্যতিরেকের প্রয়োগ কদাচিৎ দেখা যায়।

প্রতিবস্তূপমা

পরস্পর-সন্নিহিত দুই বাক্যের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হইলে তাহাদের সাধারণ ধর্ম ফলিতার্থে এক হইয়াও যদি ভিন্নরূপে বিন্যস্ত হয়, তাহা হইলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হয়।

প্রতিবস্তূপমা হইল কার্যতঃ উপমার প্রতিবস্তু, প্রতিরূপ বা তুল্যরূপ বস্তু; যেমন ছায়া। ছায়ার ন্যায় উহা সর্বাংশেই উপমার প্রতিরূপ এবং ছায়ারই ন্যায় উহা মূলে যোগ রাখিয়া ভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাতে পর্যবসানে সাধারণ ধর্মের একরূপতা ঘটে। এই অলঙ্কারে যথা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সাদৃশ্য বাচ্য হয় না। উহাতে ভিন্ন বাক্য-গত বস্তুদ্বয়ের অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের মধ্যে বস্তু-প্রতিবস্তু সম্বন্ধ (৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) থাকে। সন্নিহিত বাক্য দুইটির মধ্যে যেটি প্রস্তাবিত বা প্রাসঙ্গিক বাক্য, তাহা পূর্বে বা পরেও বসিতে পারে।

অভিন্ন সাধারণ ধর্মের ভিন্নরূপে বিন্যাস দ্বারা পুনরুক্তি-বারণ হওয়ায় রচনায় পৃথক সৌন্দর্যও আসিয়া থাকে।

উদাহরণ—

(১) উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব ; তবু তার দুঃখে ;
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে।
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরু-রাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে মলিনমুখ সেও হে সে কালে।" —মধুসূদন

এখানে পরস্পর-সন্নিহিত বাক্য দুইটি দুই দাঁড়ি দ্বারা সূচিত হইতেছে। প্রথম বাক্যটি প্রাসঙ্গিক। বাক্য দুইটির সাদৃশ্যও স্ফুট প্রতীয়মান। সাধারণ ধর্ম—দুঃখে দুঃখিত হওয়া। তাহা পরবর্তী বাক্যে দুঃখের কার্য হৃদয়বিদীর্ণ হওয়া এবং মলিন মুখ হওয়া এই ভিন্নরূপ পদ দ্বারা বুঝাইতেছে। সাদৃশ্য-জ্ঞাপক যথাদি শব্দ নাই। অলঙ্কার তাই প্রতিবস্তূপমা।

(২) "যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখদন্তে নহিক সমান
তাই বলে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ।
কোন্ নর লজ্জা পায় ?"

'নখদন্ত' ব্যাঘ্রের অস্ত্র এবং 'ধনুঃশর' মানুষের অস্ত্র। অতএব সাধারণ ধর্ম ফলিতার্থে এক হইলেও ভিন্নরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। বাক্য দুইটি পৃথক্, কিন্তু উহাদের সাদৃশ্য স্ফুট প্রতীয়মান, যথাদি শব্দ নাই। অতএব অলঙ্কার প্রতিবস্তূপমা।

(৩) "সাধু কহে,—শুন, মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টি-ধার,
সব ধর্মমাঝে ত্যাগ-ধর্ম সার
ভুবনে"। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে উপমান-বাক্যটি পূর্বে বসিয়াছে। মেঘের বৃষ্টিধারা দেওয়া ও আত্মত্যাগ করা তাৎপর্য-বিচারে একই।

(৪) ধন্য বলি দময়ন্তি, তব গুণগণ,
যে গুণে নলের মন করিলে হরণ।
কৌমুদী জলধি-জল করে আকর্ষণ,
তাহে কি বিচিত্র আর বলহ এখন।"

—হরিশচন্দ্র কবিরত্ন (নৈষধের শ্লোক-অবলম্বনে)

ইহা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের গৃহীত একটি সুন্দর উদাহরণ। এখানে 'হরণ' করা ও 'আকর্ষণ' করা ভিন্ন ধাতুর পদ হইলেও উহাদের অর্থ একই। পুনরুক্তি পরিহার করায় সৌন্দর্য বাড়িয়াছে।

বস্তু-প্রতিবস্তু সম্বন্ধের উপলব্ধি সূক্ষ্ম, তাই প্রতিবস্তূপমার প্রয়োগ বিরল না হইলেও খুব বেশি নহে। সাহিত্যে দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত

পরস্পর-সন্নিহিত দুই বাক্যের গুণক্রিয়াদি ধর্ম ফলিতার্থে এক না হইয়া যদি সদৃশ হয় এবং তাহাদের সাদৃশ্য প্রণিধান-গম্য হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়।

গুণক্রিয়াদি ধর্ম ফলিতার্থে এক না হইলেও যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহা একটু দূরাগত এবং কিঞ্চিৎ ভিন্নপ্রকার হইবেই। এই সাদৃশ্য হয় প্রণিধান-গম্য, অর্থাৎ উহা যুক্তি দ্বারা ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতে হয়। উপমেয় ও উপমানের এইরূপ সম্বন্ধকে বলে বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ (৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানেও যথা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না এবং প্রাসঙ্গিক বাক্যটি আগে বা পরে বসিতে পারে। দৃষ্টান্তে পরস্পরের ধর্মের সাদৃশ্য, কিন্তু ঐক্য বা একরূপতা নহে। প্রতিবস্তূপমাতে পরস্পরের ধর্মের ঐক্য বা একরূপতা।

উদাহরণ—

(১) দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায়! বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥"

—ভারতচন্দ্র

সন্নিহিত বাক্য দুইটির সাদৃশ্য বাচ্য না হইলেও প্রতীয়মান হইতেছে। সুন্দর ও চন্দ্রের সাদৃশ্য এবং কোটাল ও রাহুর সাদৃশ্য। কিন্তু প্রহার ও আহার

ফলিতার্থে এক নয়, নিষ্ঠুর ব্যবহার অর্থে সদৃশ মাত্র, তাহাও প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হয়। তাই উহাদের ভিন্নরূপ। যথাদি শব্দ নাই। অলঙ্কার দৃষ্টান্ত।

(২) "হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জন্ম তব কোন্ মহাকুলে?
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে,
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে?" —মধুসূদন

তিনটি বাক্যের গুণক্রিয়াদির সাদৃশ্য প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হয়। উহারা ফলিতার্থে এক নয়, তাই উহাদের ভিন্নরূপে বিন্যাস হইয়াছে। অলঙ্কার দৃষ্টান্ত।

(৩) "ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষ্যা সুমহতী।
ঈর্ষ্যা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান, লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্র-বন্ধনে;
এক সূর্য, এক শশী।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে গুন-ক্রিয়াদির সাদৃশ্য আরও দূরগত, তাই বিশেষ প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হয়।

(৪) "অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব,
কি করব বারিদ-মেহে।
এ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে॥ —বিদ্যাপতি

এখানে উপমান-বাক্য আগে বসিয়াছে। অঙ্কুর তপন-তাপে পুড়িয়া যাওয়া এবং যৌবনে বিরহে কাটান একরূপ নয়, তবে প্রণিধান করিলে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

(৫) "আঁধারে ফুটিল আলোকদীপ্তি—কাঁটায় কনক ফুল,
অন্ধ অকূল সিন্ধুর পারে দেখা দিল উপকূল,
মৃত্যু-কপিশ মূর্ছিত মুখে ফুটিল প্রাণের হাসি,
পাপের চক্ষে সহসা উঠিল পুণ্যের জ্যোতি ভাসি !
উলু উলু উলু দে'রে পুরনারী, ওরে তোরা শাঁখ বাজা—
অন্ধকারায় জনমিল আজ মুক্তিদেশের রাজা।"

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বর্ণনা। পাঁচটি উপমান-বাক্য, সবগুলিই আগে বসিয়াছে। মালা-দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

রচনার গুণে বা দোষে গুণক্রিয়াদি ধর্ম-বাচক পদগুলি সময়ে সময়ে এমন হয় যে, অলঙ্কারটি প্রতিবস্তূপমা কি দৃষ্টান্ত নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। আবার ব্যাখ্যান-চাতুর্যে দুইটি সদৃশ ধর্ম কখন কখন একরূপই বলিয়া মনে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিবস্তূপমা ও দৃষ্টান্তের সঙ্কর বলা যাইতে পারে।

সমাসোক্তি

বর্ণনীয় বস্তুতে উপমান-বস্তুর ব্যবহার অর্থাৎ অবস্থা সমারোপ করা হইলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়।

উভয় বস্তুর সমান কার্য, সমান বিশেষণ, কখন বা সমান লিঙ্গ দ্বারা এই আরোপ হইয়া থাকে। আলঙ্কারিকগণের প্রযুক্ত 'ব্যবহার' শব্দ এখানে আচরণ বুঝায় না, বুঝায় অবস্থা বা অবস্থা-ভেদ। এই 'ব্যবহারে'র আরোপ সম্যক্ সিদ্ধ হইলেই সমাসোক্তি সার্থক হয়। সমাস অর্থ সংক্ষেপ। সমাসে অর্থাৎ সংক্ষেপে উপমেয় ও উপমান এই দুই বস্তুর উক্তি হয় বলিয়া অলঙ্কারটির নাম সমাসোক্তি। ইহাকে বিশদ করিয়া ভাঙ্গিয়া বলিলে উপমা অলঙ্কার হইতে পারে। রূপকে উপমেয়ে উপমানের স্বরূপেরই আরোপ ঘটে, সমাসোক্তিতে ঘটে উপমানের ব্যবহার বা অবস্থার আরোপ, উপমান থাকে অপ্রকাশিত। রূপকে উপমান-বস্তু নিজ রূপের আরোপ করিয়া বর্ণনীয় বস্তুর রূপ আচ্ছাদন করে, সমাসোক্তিতে কিন্তু উপমান-বস্তু নিজ রূপ আচ্ছাদন করিয়া পূর্বাবস্থা হইতে বর্ণনীয় বস্তুর অধিক উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে।

অপ্রস্তুত-প্রশংসায় অপ্রস্তুত অর্থাৎ উপমান-বস্তু হয় বাচ্য এবং প্রস্তুত অর্থাৎ উপমেয়-বস্তু হয় গম্য। সমাসোক্তিতে হয় ঠিক উল্টা, উপমেয়ই হয় বাচ্য এবং উপমান গম্য।

অচেতনে চেতনের ব্যবহার আরোপই সমাসোক্তির প্রধান রূপ। চেতনবস্তুও প্রধানতঃ মানব। অচেতন বা নির্জীব বস্তুতে মানবধর্মের বা মানব-ব্যক্তিত্বের আরোপই প্রকৃত সমাসোক্তি। ইহা অনেকটা ইংরাজীর **Personification, Personal Metaphor** এবং **Pathetic Fallacy**-র তুল্য।

চেতনের উপর অচেতনের ব্যবহার আরোপেও সমাসোক্তি হইতে পারে, তবে এই দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ অতি বিরল।

উদাহরণ—

(১) "নীল সিন্ধু, শ্বেত বেলা ; বেলায় তরঙ্গ খেলা ;
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুষ্পহার,
গাহিয়া আনন্দ-গীত চুম্বি অনিবার।" —নবীনচন্দ্র

নীল সিন্ধু ও শ্বেত বেলা—এই দুইটি বর্ণনীয় বিষয়ে প্রেমিক ও প্রেমিকার ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে। শ্বেতপুষ্প—ফেনা। এখানে সমান কার্য ও সমান লিঙ্গ দ্বারা আরোপ বুঝা যাইতেছে। অলঙ্কার তাই সমাসোক্তি। ব্যঞ্জনা-শক্তি বলে বাচ্যার্থ হইতে নায়ক-নায়িকার তাদৃশ ব্যবহার-রূপ নূতন এক অর্থ প্রতীয়মান হইতেছে। দ্রষ্টব্য—এখানে এবং সকল সমাসোক্তি অলঙ্কারেই ব্যঙ্গ্যার্থ থাকে, কিন্তু তাহা ধ্বনি নহে।

(২) "নয়নে তব হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠগো শোক পরিহরি, সতি!" —মধুসূদন

মেঘনাদ সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হওয়ায় বন্দীর বন্দনা। এখানে অচেতন রাক্ষস-পুরীতে শোকাকুলা রাণীর ব্যবহার আরোপ করা হইতেছে। সমান কার্য ও সমান লিঙ্গের উল্লেখদ্বারা এই আরোপ সিদ্ধ হইয়াছে।

সকল দেশের কবিরাই সাম্রাজ্যকে রাজলক্ষ্মী এবং জন্মভূমিকে জননী বা রাজরাণী রূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। তুলনীয়—(১) কবি হেমচন্দ্র-লিখিত সমগ্র 'ভারতভিক্ষা' কবিতাটি, (২) রবীন্দ্রনাথ-রচিত সমগ্র 'ভারতলক্ষ্মী' কবিতাটি।

(৩) "পম্পা-সরোবরতীরে সূর্যদেব অস্ত যান ধীরে,
বুলায়ে আরক্তকর ক্লান্ত তপ্ত ধরণীর শিরে,
শান্তির আশিসে ভরি'……
চাহিয়া ঈর্ষ্যার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে,
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।"

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সূর্যাস্তের বর্ণনা। দুইটি বাক্যে দুইটি সমাসোক্তি, সমান কার্য ও বিশেষণ দ্বারা নানাপ্রকার চেতনের ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সমাসোক্তিতে সমান লিঙ্গ নাই; 'কুমুদ' ও 'পদ্মদল' যথাক্রমে 'কুমুদিনী' ও 'পদ্মিনী' হওয়া উচিত ছিল। প্রথম সমাসোক্তিটি শ্লেষ দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে,—কর অর্থ কিরণ এবং হাত।

(৪) "ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে,
দেখগো হেথায় হাফর হাঁফায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি।"

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কামারশালায় কাজ চলিয়াছে। কামারের যন্ত্রগুলির উপর ও আগুনের উপর শ্রান্ত ক্লান্ত শ্রমিকের ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে।

(৫) "এমনি সাঁজে আমার প্রিয়া
যেতো ছোট কলসীখানি কোমল তাহার কক্ষে নিয়া;
সোহাগে জল উথলে উঠি বক্ষে তাহার পড়ত লুটি।"

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

জলে চেতন সখীর ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে।

(৬) "কখন রস এল শুকিয়ে, এক পা এক পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে।"

লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে এখানে 'মরু'তে 'তৃষ্ণার্ত অজগর সাপের' ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে।

(৭) "অহং রাগ পরিহর, গৌরী আলাপন কর,
জয়জয়ন্তী রাগে ছাড় তান।"

এই উদাহরণটির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এখানে আগমশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের উপর সঙ্গীতশাস্ত্রের ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে। মূল অর্থ—অহঙ্কার ত্যাগ কর, শক্তি-মন্ত্র জপ কর, সাধনা দ্বারা লক্ষ্য জয় কর। আবার 'অহং', গৌরী', জয়জয়ন্তী' এগুলি প্রসিদ্ধ রাগ।

এখানে অচেতনে চেতনের ব্যবহার আরোপের প্রশ্নই উঠে না।

এইটি বাদে উল্লিখিত সমস্ত উদাহরণই অচেতনে চেতনের ব্যবহার-আরোপের।

চেতনে অচেতনের ব্যবহার আরোপ ক্বচিৎ দেখা যায়।

আধিকারিক প্রয়োগ

আদ্যন্ত সমাসোক্তি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় ছোট বড় অনেক কবিতা রচিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বা 'চঞ্চলা' কবিতা, অথবা 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার সাহিত্যিক রূপ এই সমাসোক্তি-অবলম্বনেই সৃষ্ট হইয়াছে। নির্ঝরে, নদীতে এবং সমুদ্রে চেতনের ব্যবহার-আরোপ অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব এবং মানবীয় ধর্ম-আরোপ স্পষ্ট। রূপকের ন্যায় সমাসোক্তিতেও তত্ত্ববস্তুর রূপোল্লাস দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনা 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' কবিতায় নির্ঝরে মানবীয়তা আরোপ করিয়া কবি আত্মশক্তি জাগরণের কথা, বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হওয়ার কথা, জগতে আত্মদানের সঙ্গে আত্ম-প্রসারের কথা এবং সীমার সৌন্দর্যময় লীলার মধ্য দিয়া অসীমের সার্থকতা-বরণের কথা বলিয়াছেন। 'নির্ঝরের সুপ্তিভঙ্গ, পর্বত-প্রাচীর লঙ্ঘন, জগৎ প্লাবন এবং বিচিত্র লীলালাস্যের সহিত সমুদ্রযাত্রার রূপ লইয়া বিষয়টি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা 'চঞ্চলা'

কবিতায়ও অপরূপ ভঙ্গী-সহকারে দুনিবার বেগে জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রা রূপায়িত করা হইয়াছে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিতে প্রস্তাবিত সমুদ্রে অপ্রস্তাবিত জননীর ব্যবহার আরোপ করিয়া অর্থবস্তু কাব্যরূপে উল্লসিত হইয়াছে। চৈতালির 'উৎসর্গ' কবিতাটি কিংবা কল্পনার 'দুঃসময়' কবিতাটিতে কিন্তু সমাসোক্তি নয়, রূপক। কারণ, উহাতে কেবল ব্যবহার নয়, আক্ষিপ্ত উপমানবস্তুটিরই অভেদাত্মক আরোপ সিদ্ধ হইয়াছে।

'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল,' অথবা 'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করোনা পাখা',—এই চরণ দুইটি বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের ব্যক্তব্য স্পষ্ট হইবে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী' কবিতায় রূপকের এবং 'বিধবার আর্শি' কবিতায় সমাসোক্তির আধিকারিক প্রয়োগ দেখা যায়।

নিদর্শনা

দুই বস্তুর সম্বন্ধ অ-সম্ভব এবং কোথাও বা সম্ভবপর হইয়া উপমান-উপমেয় ভাব প্রকাশ করিলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়।

নিদর্শন অর্থ—দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ। এখানে নিদর্শনা অর্থ—নিশ্চয় পূর্বক দর্শন, অর্থাৎ সাদৃশ্য আবিষ্কার।

নিদর্শনা-অলঙ্কারে সাধারণ ধর্ম বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন থাকে, তাই দৃষ্টান্তের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। নিদর্শনায় বাক্য সাধারণতঃ একটি, কখনও বা দুইটি; দৃষ্টান্তে সর্বদাই দুইটি। নিদর্শনায় বাক্যার্থ সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সাদৃশ্য বোধ জন্মে; দৃষ্টান্তে বাক্যার্থ-সমাপ্তির পর প্রণিধানদ্বারা তাৎপর্য-গ্রহণের ফলে সাদৃশ্যজ্ঞান হয়। নিদর্শনায় দুই বস্তুর সম্বন্ধ সাধারণতঃ অ-সম্ভব, দৃষ্টান্তে সর্বদাই সম্ভবপর সম্বন্ধ।

অ-সম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ

(১) "শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল-বিটপ-শোভা ধারণ করিয়াছে।"

—শকুন্তলা

শকুন্তলার অধর এবং নবপল্লব, অথবা শকুন্তলার বাহুযুগল এবং কোমল বিটপ—এই বস্তুদ্বয় একবাক্য-গত, কিন্তু উহাদের সম্বন্ধ অসম্ভব সম্বন্ধ। কারণ, অধরে ঠিক নবপল্লবের শোভা এবং বাহুযুগলে ঠিক কোমলবিটপের শোভা

থাকিতে পারে না, একের বিশিষ্ট ধর্ম অন্যে ধারণ করিতে পারে না। এখানে অর্থ—অধরে নবপল্লবের শোভার ন্যায় শোভার আবির্ভাব, বাহুযুগল কোমল-বিটপের শোভার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। অতএব অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ উপমান-উপমেয় ভাব প্রকাশ করিল। লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে,—এই সম্বন্ধ বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন। অলঙ্কার তাই নিদর্শনা।

(২) "যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমলদল খলই॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ॥" —গোবিন্দদাস

পদটির অর্থ—যেখানে যেখানে রাধিকার তনুদেহের জ্যোতি নিঃসৃত হয়, সেখানে সেখানে বিদ্যুৎ চমকায়। যেখানে যেখানে রাধিকা অরুণ চরণে চঞ্চলভাবে চলে, সেখানে সেখানে স্থলকমল দল স্খলিত হয়।......ইত্যাদি। স্পষ্ট নিদর্শনা।

(৩) "অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী,
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"—* —মধুসূদন

---

* অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের একটি শ্লোকের ছায়ায় ইহা রচিত বলিয়া মনে হয়। সেখানেও নিদর্শনা অলঙ্কার। শ্লোকটি নিম্নে দেওয়া হইল।

"ইদং কিলাব্যাজ-মনোহরং বপু
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপল-পত্র-ধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষি র্ব্যবস্যতি॥" —১ম অঙ্ক

এখানে দুই বাক্য-গত নিদর্শনা। ভিখারী রাঘবের হাতে ধনুর্ধর বীরবাহুর মৃত্যু ফুলদল দিয়া শাল্মলী তরুবরের ছেদনের ন্যায়। বস্তু-সম্বন্ধ বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবান্বিত এবং উহা উপমার পরিকল্পক হইয়াছে। কিন্তু বস্তু-সম্বন্ধ অসম্ভব—কারণ, ফুলদল দিয়া শাল্মলী তরুবরের ছেদনের প্রশ্ন উঠে না। অতএব অলঙ্কার দৃষ্টান্ত নয়, নিদর্শনা।

(৪) "কোথায় সেই সূর্য-সম্ভূত বংশ, কোথায় আমার অল্প-বিষয়া মতি! মোহবশে আমি ভেলা দ্বারা দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

—রঘুবংশ

এখানেও দুই বাক্য-গত নিদর্শনা।

(৫) "কিংবা কণ্টকিত, হায়! যে বিধি করিল
গোলাপকমল,
সে বিধি পাষাণমনে দহিতে সুকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিলা দারিদ্র্য-অনল!" —নবীনচন্দ্র

'যে' এবং 'সে' দ্বারা সংযুক্ত হইয়া এখানে এক বাক্যই হইয়াছে, বলা যায়।

সম্ভবপর বস্তু-সম্বন্ধ

উদাহরণ—

(১) "ধরাধামে বৃথা তাপ দেয় যেই জন,
সুচির সম্পদ সেই না লভে কখন,
শিক্ষা দিয়া এই কথা প্রখরকিরণ
সূর্যদেব অস্তাচলে করেন গমন।"

—(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

প্রখর-কিরণ সূর্যদেবের অস্তাচল প্রাপ্তি পর-সন্তাপীর বিপৎ-প্রাপ্তির ন্যায়। অতএব একই বাক্য-গত বস্তু দুইটি উপমান-উপমেয় ভাব প্রকাশ করিতেছে। সন্তাপদাতা সূর্যদেবেরও যখন অস্তাচলপ্রাপ্তি ঘটিতেছে, তখন তাহার পক্ষে উল্লিখিতরূপ শিক্ষাদান সম্ভবপর। অতএব বস্তু দুইটির সম্বন্ধ সম্ভবপর সম্বন্ধ।

ভ্রান্তিমান্

অতিশয় সাদৃশ্য-বশতঃ বর্ণনীয় বস্তুতে উপমান-বস্তুর ভ্রম হইয়া চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হইলে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হয়।

ভ্রমটি হইবে কাল্পনিক, কবি-প্রতিভায় উত্থিত। বাস্তবিক ভ্রম হইলে চমৎকারিত্ব থাকে না। আবার পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্য ব্যতিরেকে ভ্রম হইলেও অলঙ্কার হয় না। উদাহরণ—

(১) "দেখ সখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয়-ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করয়ে যতন।"

এখানে ভ্রমটি বাস্তবিক ভ্রম নয়। অক্ষির সহিত কুবলয়ের অতিশয় সাদৃশ্য-হেতু কবি-প্রতিভায় সৃষ্ট এই ভ্রম। তাই অলঙ্কার ভ্রান্তিমান্।

(২) "বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান, সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত—
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে!
বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে।"
—মধুসূদন

ইন্দ্রের জ্যোতির্ময় রথ এবং উদীয়মান সূর্যের অতিশয় সাদৃশ্যহেতু কবি-কল্পিত ভ্রম বর্ণিত হইয়াছে। অবোধ পাখী এবং বাসরের লজ্জাশীলা কুলবধূর পক্ষেই এইরূপ ভ্রম স্বাভাবিক। এখানে 'বুঝি' শব্দ নিরর্থক। ভ্রমের কার্য দেখা যাইতেছে, কাজেই উৎপ্রেক্ষা হইতে পারে না।

'রজ্জুতে সর্প-ভ্রম', বা 'শুক্তিতে রজত-ভ্রম', কিংবা ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির-সভায় দুর্যোধনের বিচিত্র ভ্রম, অথবা মেঘনাদবধ-কাব্যে লক্ষ্মণকে অগ্নি-দেব বলিয়া ভ্রম—সকলই বাস্তবিক ভ্রম; এই সকল ক্ষেত্রে কোন অলঙ্কার নাই।

এইরূপ বিরহ-জনিত, অতিশয় ভাবনা- বা উন্মাদাদি-জনিত ভ্রমও বাস্তবিক ভ্রম, উহাতে কবি-কল্পনার স্পর্শ নাই, তাই অলঙ্কার নাই।

সন্দেহ

বর্ণনীয় বস্তুতে আক্ষিপ্ত উপমান-বস্তুর সংশয় হইয়া চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হইলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়।

এই সংশয়ও কাল্পনিক, কবি প্রতিভায় উত্থিত, কবি-প্রৌঢ়োক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে উৎপ্রেক্ষায় উপমান-বিষয়ে উৎকট এক-কোটিক সংশয়, সন্দেহে উভয়-কোটিক সংশয়, অর্থাৎ উপমেয় ও উপমান উভয়-বস্তুতে সমান সংশয়।

'মুখ, না চাঁদ!'—সন্দেহ অলঙ্কার হইলে মুখ ও চাঁদ ইহাদের যে কোনটি হইবার সমান সম্ভাবনা। উৎপ্রেক্ষায় কিন্তু চাঁদ হইবারই প্রবল সম্ভাবনা।

সমগ্র বাক্যে কিংবা তাহার যে কোন অংশে সংশয় থাকিলেই সন্দেহ অলঙ্কার হয়। তাই বাক্যটি কেবল সন্দেহে পর্যবসিত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে শুদ্ধ সন্দেহ। আবার বাক্যের আদিতে ও অন্তে সন্দেহ থাকিয়া মধ্যে নিশ্চয় থাকিতে পারে, এইরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয়-গর্ভ সন্দেহ। আবার বাক্যের প্রথমাংশে সন্দেহ ও শেষাংশে নিশ্চয় থাকিতে পারে, এইরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ। উদাহরণ—

(১) "একি মেঘশ্রেণী, না হিমালয়?"

শুদ্ধ সন্দেহ। উপমেয় ও উপমান দুই পক্ষেই সমান সংশয়। মেঘ-শ্রেণীও হইতে পারে, হিমালয়ও হইতে পারে।

(২) "কে তুমি হেথা বিজনে বসি নর, কি ঋষি, দেবতা?
অঙ্গ ছাপি পুণ্যপ্রভা চমকে!" —বিজয়চন্দ্র মজুমদার

(৩) "কুঞ্জের দ্বারে ঐ কে দাঁড়ায়ে? ওকি বারিধর কি গিরিধর?
ওকি ইন্দ্রধনু যায় দেখা, নাকি চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা?
ওকি বকশ্রেণী যায় চলে, নাকি মুক্তামালা গলে দোলে?
ওকি সৌদামিনী মেঘের গায়, নাকি পীতবসন দেখা যায়?
ওকি মেঘের গর্জন শুনি, নাকি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি?"
—কৃষ্ণকমল গোস্বামী

কৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীমতী রাধিকার সংশয় একপ্রকার সাঙ্গ সন্দেহ-অলঙ্কার আশ্রয়ে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও শুদ্ধ সন্দেহ। প্রথম পক্ষে বারিধর, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি উপমানগুলি ; অপর পক্ষে গিরিধর, ময়ূর-পাখা প্রভৃতি উপমেয়গুলি ; উভয় পক্ষেই সমান সংশয়। অঙ্গী হইতেছে বারিধর ও গিরিধর, বাকীগুলি অঙ্গ। তবে মেঘের গর্জনে বংশীধ্বনির সংশয় একান্ত অস্বাভাবিক। ইহা অতিশয় কষ্টকল্পনা-প্রসূত।

বাস্তবিক সংশয়-স্থলে সন্দেহ-অলঙ্কার হয় না। সুন্দরের সুরঙ্গ হইতে উঠিবার পর বিদ্যার সখীগণের যে দেব কি দানব বলিয়া সংশয়, তাহা প্রকৃত সংশয়। কবি-প্রতিভায় সৃষ্ট নহে বলিয়া সেখানে অলঙ্কার নাই।

অপহ্নুতি

বর্ণনীয় বস্তুকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া আক্ষিপ্ত উপমান-বস্তুর স্থাপন হইলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়।

অপহ্নুতি অর্থ—গোপন, অস্বীকার বা নিষেধ। ইহাও একপ্রকার অভেদ-কল্পনার ফল। অভেদ-কল্পনার মূলে উপমান-উপমেয়ের প্রবল সাদৃশ্য। অপহ্নুতিতে উপমানেরই গৌরব। অপহ্নুতির মূলে কখন কখন সমাসোক্তির প্রভাব থাকে। ইহাও দুই প্রকার,—উপমেয়ের অপহ্নব বা নিষেধ-পূর্বক উপমানের আরোপ, অথবা উপমানের আরোপ-পূর্বক উপমেয়ের অপহ্নব বা নিষেধ।

অপহ্নুতিতে সাক্ষাৎ ভাবে 'না', 'নয়' বা 'নহে' শব্দ দ্বারা নিষেধ করা হয় ; অথবা 'ব্যাজ', 'ছল', 'বুঝি' প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে উহা বুঝান হয়।

উদাহরণ—

(১) "তারাই আজ নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হ'য়ে অন্নহারা ;
দেশের যত নদীর ধারা, জল না, ওরা অশ্রুধারা !" —নজরুল ইসলাম

এখানে অপহ্নব-পূর্বক আরোপ। নদীর ধারা জল নয়,—এখানে বর্ণনীয় বস্তুর নিষেধ। ওরা অশ্রুধারা,—এখানে উপমানের আরোপ। অপহ্নুতির মূলে জল ও অশ্রুজলের সাদৃশ্য।

(২) "নভস্তল নয় ইহা, নীল অম্বুরাশি ;
তারা নয় এ সকল, যায় ফেনা ভাসি ;
শশী নয়, ফণিরাজ আছে কুণ্ডলিত ;
কলঙ্ক নহে তো উহা, মাধব শায়িত।" —(সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বনে)

এখানেও অপহ্নব-পূর্বক আরোপ।

(৩) "কপালে সিন্দুরবিন্দু নব অরবিন্দবন্ধু,
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তলছলা
বন্দী সে করিলা রবি-ইন্দু॥" —মুকুন্দরাম

সিন্দূরবিন্দু অরুণ বা সূর্য, চন্দনের বিন্দু চন্দ্র। কুন্তলের ছলে তিমিররাশি সূর্যচন্দ্রকে বন্দী করিল। এখানেও অপহ্নব-পূর্বক আরোপ।

(৪) "বৃষ্টি-ছলে গগন কাঁদিলা।" —মধুসূদন

(৫) "রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥" —গোবিন্দদাস

(৬) "গৌরীর বদন শোভা লখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিনতা সেই শোকে না বিচারি সর্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা।" —মুকুন্দরাম

বাক্যটির দ্বিতীয়াংশে অপহ্নুতি বলা যাইতে পারে। চাঁদে উহা কলঙ্ক নয়, দুঃখ-হেতু মলিনতা মাত্র। কেহ কেহ গূঢ় অপহ্নুতি বলেন।

অপহ্নুতির শ্লেষাশ্রিত এক প্রকার অপহ্নুতি আছে। বাঙ্গালায় উহার প্রয়োগ নাই।

নিশ্চয়

উপমান-বস্তুকে নিষিদ্ধ করিয়া বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয়কে স্থাপিত করা হইলে নিশ্চয় অলঙ্কার হয়।

'নিশ্চয়' অর্থ নির্ধারণ, প্রকৃত বা উপমেয়-বস্তুর সুদৃঢ় নির্ধারণ। ইহা অপহ্নুতির বিপরীত।

'মুখ নহে, চাঁদ।'—অপহ্নুতি।
'মুখই, চাঁদ নহে।'—নিশ্চয়।
'মুখ? না চাঁদ?'—সন্দেহ।
'মুখ যেন চাঁদ!'—উৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ—

(১) "অসীম নীরদ নয়,
ওই গিরি হিমালয়!" —বিহারীলাল

উপমান নীরদ বা মেঘকে নিষিদ্ধ করিয়া বর্ণনীয় বস্তু হিমালয়ের স্থাপন করা হইল। উভয়ের সাদৃশ্য-বশে অপহ্নুতি, বা সন্দেহ উৎপ্রেক্ষার ভাব আসিতে পারিত।

(২) "এ নহে অরুণ-আভা, নহে শশধর-বিভা,
হিমমাঝে বুঝি গৌরীর গৌর আভা হাস রে!" —নবীনচন্দ্র

(৩) "আমি নারী, হর নই শুনরে মদন,
বিনা অপরাধে কেন বধরে জীবন?
এ যে বেণী, ফণী নয়, নহে জটাজূট;
কণ্ঠে নীলকান্ত আভা, নহে কালকূট;
কপাল চন্দনবিন্দু সিন্দুর দেখিয়ে,
ভ্রমেতে ভেবেছ মদন, শশী হুতাশন!"*
—রাম বসু (লালমোহন বিদ্যানিধি-কর্তৃক উদ্ধৃত)

বিরহিণী রাধিকার উক্তি। পরপর অন্ততঃ চারিটি নিশ্চয় অলঙ্কার।

(৪) "কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নি-সম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ, স্বর্ণবর্ণ-আভা

* বিদ্যাপতির এইরূপ একটি প্রসিদ্ধ পদ আছে—"কতি হুঁ মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহুঁ শঙ্কর, হোঁ বরনারী।" —ইত্যাদি। ইহারও পূর্বে এইরূপ পদ রচনা করিয়াছেন কবি জয়দেব, যথা—"হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গম-নায়কঃ"—ইত্যাদি। এই দুই ক্ষেত্রেই নিশ্চয় অলঙ্কার। রাম বসুর পদ ইহাদেরই অনুকরণ।

অস্ত্রাদির তেজঃসহ মিশি উজলিছে
দশদিশ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে।" —মধুসূদন

রাজা রাবণের যুদ্ধ-সজ্জা। পর পর তিনটি নিশ্চয় অলঙ্কার।

প্রতীপ

প্রসিদ্ধ উপমান-বস্তু যদি উপমেয়-রূপে কল্পিত হয়, অথবা, প্রসিদ্ধ উপমান-বস্তুর যদি নিষ্ফলত্ব বর্ণিত হয়, তাহা হইলে প্রতীপ অলঙ্কার হয়।

কেহ কেহ বলেন, প্রসিদ্ধ বস্তুর অতিশয় উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া তাহাকে উপমান-রূপে কল্পনা করিলেও প্রতীপ অলঙ্কার হয়।

প্রতীপ অর্থ—বিপরীত। অলঙ্কারটির লক্ষণ বিচার করিলেই এই নামের সার্থকতা বুঝা যাইবে।

(১) "তোমার নয়ন-সম বটে ইন্দীবর,
তাহাও নিমগ্ন হ'ল সলিল ভিতর ;
তব মুখতুল্য শশী জগতে বিদিত।
কালবশে কালো মেঘে হ'ল আচ্ছাদিত॥"
(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

স্পষ্টতঃ প্রথম প্রকার প্রতীপ। কারণ, প্রসিদ্ধ উপমান বস্তু ইন্দীবর বা শশী উপমেয়-রূপে কল্পিত হইয়াছে। ইন্দীবর-সম নয়ন নয়, নয়ন-সম ইন্দীবর। এইরূপ শশি-তুল্য মুখ নয়, মুখ-তুল্য শশী।

(২) "আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তল-সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।" —রবীন্দ্রনাথ

ইহাও প্রথম প্রকার প্রতীপ ; কারণ, মেঘ-সম কুন্তল নয়, কুন্তল-সম মেঘ।

(৩) "অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেবদৈত্য ;
—মধুসূদন

এখানে প্রসিদ্ধ উপমান-বস্তু অমৃতের নিষ্ফলত্ব বর্ণিত হইয়াছে। অতএব দ্বিতীয় প্রকার প্রতীপ। এখানে অলঙ্কার ব্যতিরেক নয়, কারণ, ব্যতিরেকে

সাক্ষাৎভাবে উপমেয়ের অতিশয় উৎকর্ষ দেখান হয়, প্রতীপে উপমানকে উপমেয়রূপে কল্পনা কিংবা নিরর্থক বা নিষ্ফল প্রতিপন্ন করা হয়।

(৪) " 'সুদারুণ আছে যত, সকলের গুরু'—
হলাহল! হেন গর্ব না করিও মনে,
তোমার সদৃশ বহু দুর্জন-বচন
আছে, ইহা সুনিশ্চিত জানে ত্রিভুবনে।"

(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

ইহা তৃতীয় প্রকার প্রতীপ। প্রসিদ্ধ বস্তু হলাহলের বর্ণনা করিয়া তাহাকে উপমান-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

সাদৃশ্য-মূল প্রধান অলঙ্কারগুলির আলোচনা এতক্ষণে শেষ হইল। অলঙ্কার-শাস্ত্রে এইটিই শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। গূঢ়ার্থ-মূল অলঙ্কারের মধ্যে কোথাও কোথাও সাদৃশ্যের ভাব থাকে। সাদৃশ্যের বিপরীত হইল বিরোধ। এই বিরোধ মুখ্যতঃ কার্য-কারণের সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গীতে প্রকাশ পায়।

বিরোধ-মূল অলঙ্কার

বিভাবনা

কারণ বিনা কার্যোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হইলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়।

'কারণ বিনা' অর্থ—প্রসিদ্ধ কারণ বিনা। সূত্রটির অর্থ—প্রসিদ্ধ কারণ বিনা যেখানে অপ্রসিদ্ধ কারণ অপেক্ষা করিয়া কার্যোৎপত্তি বর্ণিত হয় এবং তাহাতে চমৎকারিত্ব জন্মে, সেখানে অলঙ্কারটির নাম বিভাবনা। বিভাবনা অর্থ—যাহাতে কারণ বিভাবিত বা বিচারিত হয়। এই অপ্রসিদ্ধ কিন্তু প্রকৃত কারণ কোথাও উক্ত, কোথাও বা অনুক্ত থাকে। উদাহরণ—

(১) "আয়াস নাহিক কিছু তবু কটি তনু
ভূষণ নাহিক কিছু তবু শোভে তনু॥
ভয় নাহি তবু আঁখি সতত চঞ্চল।
সকলি কেবল নবযৌবনের ফল॥ "—(সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বনে)

কটির তনুত্ব অর্থাৎ কৃশত্ব, তনুর অর্থাৎ শরীরের শোভনত্ব এবং আঁখির চঞ্চলত্ব—ইহাদের প্রসিদ্ধ কারণ যথাক্রমে আয়াস বা পরিশ্রম, ভূষণ এবং ভয়। এখানে প্রসিদ্ধ কারণ বিনাই কার্যোৎপত্তি বর্ণিত হওয়ায় অভিনব চমৎকারিত্ব হইয়াছে। অলঙ্কার তাই বিভাবনা।

কবিতাটির শেষ চরণে দেখা যাইবে অপ্রসিদ্ধ কারণ নব যৌবন উক্ত হইয়াছে।

উল্লিখিত কবিতারই শেষ চরণ যদি হয় 'রমণীর রূপ-সুধা মধুর কেবল', তাহা হইলে নব যৌবন-রূপ অপ্রসিদ্ধ কারণ অনুক্ত থাকিবে।

(২) "সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে।" —কাদম্বরী

এখানে প্রকৃত কারণ 'ধনমদ' উক্ত হইয়াছে।

(৩) "ত্রাস নাই, আত্মরক্ষা করে নিরন্তর।
রোগ নাই, তবু ধর্ম-সেবনে তৎপর॥
অর্থের সঞ্চয় আছে, কিন্তু নাহি লোভ।
ব্যসনী নহেন, তবু বিষয়-সম্ভোগ॥"
—(রঘুবংশ) (লালমোহন বিদ্যানিধি-কৃত সংস্কৃতের অনুবাদ)

রঘুবংশ কাব্যে রাজা দিলীপের বর্ণনা। এখানে সংযম-পূত স্বভাবধর্ম ও রাজধর্ম-রূপ প্রকৃত কারণ অনুক্ত রহিয়াছে।

(৪) "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত,
বিনা বাতে নিবে গেল মঙ্গল-প্রদীপ।" —অমৃতলাল বসু

এখানেও অপ্রসিদ্ধ কিন্তু প্রকৃত কারণ আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যু অনুক্ত রহিয়াছে।

বিশেষোক্তি

কারণ-সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি না হইলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়।

কার্যোৎপত্তি অর্থ—স্বাভাবিক কার্যোৎপত্তি। এইরূপ স্থলে স্বাভাবিক কার্যোৎপত্তি না হইয়া অনেক সময়ে বরং বিরুদ্ধ কার্যোৎপত্তি দেখা যায়।

এখানেও কার্যোৎপত্তি বা ফলোৎপত্তি না হওয়ার প্রকৃত কারণ কোথাও উক্ত, কোথাও বা অনুক্ত থাকে। অনুক্ত কারণকে কোথাও আবার অচিন্ত্য কারণ বলা হয়। বিশেষোক্তি অর্থ—"বিশেষের (অনুৎপত্তি নিমিত্তের) উক্তি বা অবগতি যাহাতে।"—(কুবলয়ানন্দ টীকা)

(১) "মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক্,"—রবীন্দ্রনাথ

মহৈশ্বর্য-রূপ কারণের স্বাভাবিক কার্য বা ফল ঔদ্ধত্য। এইরূপ মহাদৈন্য, সম্পদ ও বিপদের সম্ভাবিত ফল যথাক্রমে নতি, সাহস বা গর্ব এবং ভয়। এখানে তা স্বাভাবিক কার্যোৎপত্তির অভাব, বরং বিরুদ্ধ কার্য নম্রতা প্রভৃতির উৎপত্তি দেখা যায়। কাজেই বিশেষোক্তি অলঙ্কার। চারিটি চরণ পরেই ব্যাপারটির প্রকৃত কারণ উক্ত হইয়াছে,—"অযোধ্যার রঘুপতি রাম", লোকোত্তর মহিমা-সম্পন্ন পুরুষ, বিরুদ্ধগুণের মিলন-স্থল রামচন্দ্রেই ইহা সম্ভবপর।

(২) "অদ্যাপি ভুবন-জয়ী স্মর অতি খল,
তনু বিনাশিল শিব, না টুটিল বল!" —(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

শিব-কর্তৃক তনু-নাশ রূপ কারণ সত্ত্বেও বল-নাশ রূপ কার্যের অভাব, পরন্তু এখনও ভুবন জয় করিতে থাকা রূপ বিরুদ্ধ কার্য দেখা যাইতেছে। অলঙ্কার বিশেষোক্তি। এখানে কারণ অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা বোধগম্য নয় বলিয়া বলা হইয়া থাকে।

দ্রষ্টব্য—"যদি করি বিষ পান, তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই॥" —ভারতচন্দ্র

এখানে কোন অলঙ্কার নাই। ব্যাসদেব চিরজীবী হইবেন—এই বর পাইয়াছিলেন। এখানে এই বাস্তব ঘটনার উল্লেখ মাত্র। কোন চমৎকারিত্ব নাই।

অসঙ্গতি

একত্র কারণ এবং অন্যত্র কার্য থাকিলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়।

কারণ ও কার্য ভিন্ন আশ্রয়ে থাকে বলিয়া সঙ্গতির অভাব-হেতু অলঙ্কারটির নাম অসঙ্গতি। আশ্রয় বলিলে স্থান, কাল, পাত্র অর্থাৎ ব্যক্তি সকলই বুঝাইতে পারে। অনেক সময় যমক বা শ্লেষ দ্বারা অলঙ্কারটির পোষকতা করা হয়।

(১) "একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।" —ভারতচন্দ্র

মদন-ভস্মের পর রতি-বিলাপ। আগুন থাকে শিবের কপালে, কিন্তু তাহার দাহ-কার্য দেখা গেল রতির কপালে। শিবের কপাল কদাচ দগ্ধ হয় না, অথচ মদনবিনাশ-হেতু রতির কপালই পুড়িয়া গেল, অর্থাৎ সর্বনাশ হইল। এখানে পরবর্তী 'কপাল' অর্থ ভাগ্য। যমক দ্বারা অলঙ্কারটি পুষ্ট হইয়াছে।

(২) "অলি করে মধু পান, উন্মত্ত কোকিলগণ,
তরুগণ ঘূর্ণিত।
পথিক পতিত তলে, যুবতী মূর্ছে সকলে,
বিরহী রোদিত॥" —গীতরত্ন

বসন্ত-বর্ণনা। কিন্তু বাচন-ভঙ্গী লক্ষ্য করিবার মত। বসন্তে অলি মধু পান করে। মধু শব্দের এক অর্থ মদ্য। এই শ্লেষদ্বারাই অলঙ্কারটি পুষ্ট হইয়াছে। অলি মধু বা মদ্য পান করিলে মদ্যপানরূপ কারণের কার্য-সমূহও—যথা—উন্মত্ত হওয়া, ঘূর্ণিত হওয়া, পতিত হওয়া, মূর্ছিত হওয়া বা রোদন করা—অলিতেই থাকা উচিত; কিন্তু তাহা দেখা যাইতেছে যথাক্রমে কোকিল, তরু, পথিক, যুবতী ও বিরহী এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে। অতএব অসঙ্গতি অলঙ্কার।

(৩) "হৃদয়মাঝে মেঘ উদয় করি।
নয়নের পথে বরিখে বারি॥" —জ্ঞানদাস

মেঘ—শ্যামসুন্দর। রাধার পূর্বরাগের বর্ণনা। হৃদয়ে শ্যাম-জলধর, নয়নে প্রেমাশ্রু। কারণ হৃদয়ে, কার্য নয়নে। অসঙ্গতি অলঙ্কার।

বিষম

বি-ষম অর্থাৎ বি-সদৃশ বস্তুদ্বয়ের বর্ণনা-বিশেষ হইতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হইলে বিষম অলঙ্কার হয়।

ইহা তিন প্রকার।

কারণ ও কার্যের গুণ বা ক্রিয়া পরস্পর-বিরুদ্ধ হইলে প্রথম প্রকার বিষম; আরব্ধ কার্যের বৈফল্য এবং নূতন অনর্থের উৎপত্তি হইলে দ্বিতীয় প্রকার বিষম; এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের একত্র সঙ্ঘটন হইলে তৃতীয় প্রকার বিষম অলঙ্কার হয়।

প্রথম প্রকার বিষম

(কারণ ও কার্যের গুণ বা ক্রিয়ার বিরুদ্ধতা)

(১) "রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি
উছলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী।" —যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কালীর তিমিররাশি-রূপ ত্রিভুবন অন্ধকার না করিয়া উজ্জ্বল করিতেছে। কারণ তিমিররাশির কার্য হইল ত্রিভুবনে দীপ্তি। অতএব কারণ ও কার্যের গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় প্রথম প্রকার বিষম।

(২) "উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ-ঘটায়॥" —গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কালো বরণ-ঘটার কার্য হইল উজ্জ্বল আলোর ঝলক। অতএব কারণ ও কার্যের গুণের পরস্পর-বিরুদ্ধতা।

দ্বিতীয় প্রকার বিষম

(আরব্ধ কার্যের বৈফল্য এবং নূতন অনর্থের উৎপত্তি)

(১) "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥

উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধজলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥"

(২) "রত্নের আশায় সেবা করি রত্নাকরে,
রত্ন দূরে থাক্, মুখ পূর্ণ হ'ল ক্ষারে।" —(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

তৃতীয় প্রকার বিষম

(বিরুদ্ধ বস্তু-দ্বয়ের একত্র সঙ্ঘটন)

(১) "অঙ্গনা-জনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তেজঃপুঞ্জ তপোরাশি মুনি-কুমারই বা কোথায়, সামান্যজন-সুলভ চিত্তবিকারই বা কোথায়!" —কাদম্বরী

তপোরাশি ও চিত্তবিকার এই দুই বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র সঙ্ঘটন।

(২) "কমলবদন, কুবলয় দুই লোচন অধর মধুরি নিরমানে।
সকল শরীর কুসুম তুয় সিরজল কিঅ দঈ হৃদয় পথানে॥"

—বিদ্যাপতি (সংস্কৃত শ্লোকের অবলম্বনে)

এখানে কমলবদন প্রভৃতি এবং পাষাণহৃদয়ের একত্র সঙ্ঘটন।

(৩) "এমন উর্বশী-মেনকা-রম্ভা-গর্ব-খর্ব-কারিণী সুন্দরীর সারি আর
কোথাও নাই;
এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।" —বঙ্কিমচন্দ্র

বিরোধাভাস

দুইটি বস্তু আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইয়া চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়।

সংস্কৃতে এই অলঙ্কারের প্রচলিত নাম **বিরোধ**।

এই বিরোধ মুখ্যতঃ বাচন-ভঙ্গীতেই থাকে, তাৎপর্য-বিচারে উহার অবসান হয়। ইহা এক প্রকার ছল আঘাত, অকস্মাৎ বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া অর্থের ঘনীভূত রূপের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাস্তবিক বিরোধ-স্থলে অলঙ্কার হয় না।

বিরোধাভাস সমগ্র বাক্য-গত, অথবা কেবল মাত্র সন্নিহিত দুইটি শব্দ-গত হইতে পারে। প্রথম প্রকার বিরোধ Epigram-এর সহিত এবং দ্বিতীয় প্রকার বিরোধ Oxymoron-এর সহিত তুলনীয়। তৃতীয় প্রকার বিরোধের কল্পনা করা যাইতে পারে যদি বিরোধাভাস না জন্মাইয়া বৈপরীত্য-বোধক শব্দের একত্র সন্নিবেশ ঘটে এবং সঙ্গত অর্থই বিশিষ্টতা লাভ করে। ইহা ইংরাজীর Antithesis। ইহাকে ব্যাপক অর্থে বিরোধের পর্যায়-ভুক্ত করা গেলেও বিরোধাভাস অলঙ্কারের অন্তর্গত করা যাইতে পারে না। পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের একত্র স্থাপন অর্থে 'প্রতি-বিন্যাস' বা 'বিরুদ্ধ-বিন্যাস' নাম দিয়া ইহার পৃথক্ আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) "যদি বড় হ'তে চাও, ছোট হও তবে।" —ঈশ্বর গুপ্ত

এখানে বড় অর্থ—মহান্ এবং ছোট অর্থ—বিনয়ী। কাজেই প্রকৃত বিরোধ নাই।

(২) "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

(৩) "অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।" —ভারতচন্দ্র

এখানেও বিরুদ্ধ-প্রতীতি হইলেও অলৌকিক মহিমাময় ভগবানের বর্ণনা বলিয়া বিরোধের ভঞ্জন হইয়াছে।

(৪) "চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল, চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বূল লাগে যেন শূল, গীতনাট ঝন্‌ঝনা॥
ফুলের মালায় সূচের জ্বালায় তনু হইল জর জর।
মন্দ মন্দ বায় যেন বজ্র ঘায় অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
কোকিল-হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে কানে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার পোড়ায় মোর শরীর॥" —ভারতচন্দ্র

পর পর আটটি বিরোধাভাস। বর্ণনীয় বিষয় একই। কাজেই মালা-বিরোধাভাস বলা যাইতে পারে। এখানে বিদ্যার বিরহ-ব্যথার প্রসঙ্গ দ্বারা বিরোধের অবসান হইতেছে।

(৫) "বেদানা তাহার নাম দানা যায় ভরা।
কেমনে হইবে সেই সর্বমনোহরা?" —ঈশ্বর গুপ্ত

এখানে শ্লেষাশ্রিত বিরোধাভাস বলা যাইতে পারে॥
বেদানা শব্দটি শ্লিষ্ট।

এইরূপ আর একটি উদাহরণ—

"পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর অপরাজিতা নাম?" —যতীন্দ্রমোহন বাগচী

(৬) "ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে—
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে!"
—গোলাম মোস্তাফা

(৭) "মিলন ও বিরহের মধ্যে বরং তাহার সহিত বিরহই হউক, মিলন যেন হয় না। কারণ, মিলনে সে একা, বিরহে সে ত্রিভুবনময়।"
—(সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ)

শেষ বাক্যটিতে চমৎকার বিরোধাভাস।

(৮) "মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা!" —রবীন্দ্রনাথ

(৯) "বিস্তারিছ কোমলতা, হে শুষ্ক কঠিনা।
হে দরিদ্রা, পূর্ণা তুমি রত্নে ধান্যে ধনে।" —রবীন্দ্রনাথ (ধুলি)

(১০) 'জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে।" —রবীন্দ্রনাথ

(১১) "যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণ-স্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি'
পলকে পলকে,
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে তিনটি সুন্দর বিরোধাভাস।

(১২) "করিলে বরণ
রূপ-হীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।"
—রবীন্দ্রনাথ

(১৩) "অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান্ করিতেছে।" —রবীন্দ্রনাথ ('পাগল')

(১৪) "যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে,
তাহারাই প্রবল ভাবে ভোগ করিতে পারে।" —রবীন্দ্রনাথ

(১৫) "আসল কথা, মৃত্যু আছে বলেই বেঁচে সুখ।" —প্রমথ চৌধুরী

বিরোধাভাস ও Epigram

এখানে উল্লেখ করা উচিত আমাদের বিরোধাভাস ইংরাজীর Epigram হইলেও ইংরাজীর Epigram কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই আমাদের বিরোধাভাস নয়। পণ্ডিতগণের মতে সংক্ষিপ্ত উক্তি যদি idea বা ভাবটিতে কোন 'unexpected turn' বা আকস্মিক গতি-ভঙ্গী দেয়, তাহা হইলেই Epigram হইতে পারে। এই *'apparent contradiction'*-এর ন্যায় *'emphatic assertion of a truism'* (যেমন—'His coming was an event'), অথবা *'a sudden turn of thought in a different spirit'* (যেমন —'He is full of information—like yesterday's Times'), অথবা *'play on words'* (যেমন—'Those laborious orators who mistake perspiration for inspiration') প্রভৃতির প্রয়োগ স্থলেও Epigram হইয়াছে বলা হইয়া থাকে। Surprise বা তাকলাগান উহার একটি প্রধান লক্ষণ। অবশ্য বিরোধাভাস বা *apparent contradiction*-ই উহার সর্বাধিক পরিচিত রূপ।

বিরোধোক্তি (Oxymoron)

ইহা বিরোধাভাসেরই একটি বিশিষ্ট ও জোরাল রূপ, প্রায় তাহার চরম রূপ। এখানে বিরোধ-বাচক শব্দ দুইটি পরস্পরের সন্নিহিত থাকিয়া একান্ত উগ্রভাবে বিরোধ ভাবটিকে ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু এ বিরোধও বিরোধের আভাস বা ছলনা মাত্র, তাৎপর্য-বিচারে উহার অবসান হয়। পূর্ব-বর্ণিত বিরোধাভাস বাক্য-গত, এই বিরোধোক্তি প্রধানতঃ সন্নিহিত দুইটি শব্দ-গত। এই শব্দ দুইটি কখনও একই বিশেষ্যের দুইটি বিশেষণ, অথবা একই ক্রিয়াপদের

দুইটি ক্রিয়াবিশেষণ, কখনও বা নিজেরাই বিশেষ্য-বিশেষণ হইয়া থাকে। উদাহরণ—

(১) 'করিয়াছি তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞ জনে," —রবীন্দ্রনাথ

'মূঢ়' ও 'বিজ্ঞ' এই দুইটি বিরোধ-বাচক শব্দ পরস্পর সন্নিহিত থাকিয়া বিরোধকে প্রায় চরম করিয়াছে। তথাপি এখানে বাস্তবিক বিরোধ নয়। প্রকৃতপক্ষে মূঢ়, কিন্তু বাহিরে বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত—এইভাবে বিরোধের ভঞ্জন হয়। এখানে দুইটি শব্দই 'জনে'-এর বিশেষণ।

(২) "পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার
ভীষণে মধুরে দিক্ ঝঙ্কার।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে অ-শিবের ধ্বংস-হেতু ভীষণ এবং শিবের প্রতিষ্ঠা-হেতু মধুর—এইভাবে বিরোধের ভঞ্জন হয়। এখানে দুইটিই একই ক্রিয়াপদের ক্রিয়া-বিশেষণ। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে এই দুইটি শব্দই একই বিশেষ্য-পদের দুইটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—

"ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে," —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(৩) "সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ;" —রবীন্দ্রনাথ

'সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টি'—এখানে বিরোধ-বাচক শব্দ দুইটির বিশেষ্য-বিশেষণ সম্পর্ক। তুলনীয়—বে-আইনী আইন ('lawless law')।

(৪) "শেয়ান পাগল বুচকি আগল, কাজ হবে না ওরূপ হ'লে।"
—মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (শাক্ত পদ)

(৫) "কি রহস্য ধেয়াইছে দিগন্ত-শয়নে
জ্যোতির্ময়ী তমস্বিনী বিনিদ্র নয়নে ?"—মোহিতলাল মজুমদার

(৬) "সেই দহনের মিঠা বিষে মোর মদনের আরাধনা !"
—মোহিতলাল মজুমদার

বিশ্লেষণের সুবিধা হইবে মনে করিয়া ইংরাজী Oxymoron-কে 'বিরোধোক্তি' নাম দিয়া বিরোধ বা বিরোধাভাসের অন্তর্গত উহারই এক ভেদরূপে দেখান হইল।

প্রতি-বিন্যাস
বা
বিরুদ্ধ বিন্যাস

বিরুদ্ধ ভাব বা বস্তুর একত্র সন্নিবেশ দ্বারা সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইলে প্রতি-বিন্যাস বা বিরুদ্ধ বিন্যাস অলঙ্কার হয়।

এই সন্নিবিষ্ট ভাব বা বস্তুর পরস্পর বিরুদ্ধতা প্রায়ই বৈপরীত্য বা contrast বুঝাইয়া থাকে। ইহা একই বাক্যে দুই শব্দ বা শব্দসমষ্টি আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে, আবার সন্নিহিত দুই বাক্য আশ্রয় করিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে। অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতের ন্যায় বৈপরীত্য-সূত্রে বাক্যার্থ আকস্মিক দীপ্তি এবং বলিষ্ঠতা লাভ করে।

এই অলঙ্কারটি ইংরাজী হইতে গৃহীত হইল। ইংরাজী Antithesis (Gk. *anti* against ; and *tithemi*—I place)-এর আক্ষরিক অনুবাদই বিরুদ্ধ স্থাপন, অর্থাৎ বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র স্থাপন। তাই বাঙ্গালায় নামকরণ হইল—'প্রতি-বিন্যাস' বা 'বিরুদ্ধ বিন্যাস'। প্রতি উপসর্গ বিরোধ ও বৈপরীত্য বুঝাইয়া থাকে।

(১) "কৃপা চাহি না হে, কৃপাণ চেয়েছি,"

'কৃপাণ চেয়েছি' বলিলেই কৃপা চাহি নাই বুঝা যায় বটে, কিন্তু বৈপরীত্য-বোধক 'কৃপা চাহি নাই' বলায় মূল অর্থ অনেক জোরাল ও সুন্দর হয়। কৃপা—অনুগ্রহ, কৃপাণ—এখানে আত্মশক্তি বা আত্মপ্রত্যয়।

দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালায় এইরূপ বিরুদ্ধ বিন্যাসে প্রায়ই একানুপ্রাস বা ছেকানুপ্রাসের প্রয়োগ দেখা যায়।

(২) "যত পায় বেত, না পায় বেতন" —রবীন্দ্রনাথ

(৩) "অস্ত গেল রোষ, উদয় রস।" —ভারতচন্দ্র

(৪) "শক্তের ভক্ত নরমের যম।" —জাতীয় প্রবাদ বাক্য

(৫) "এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;" —রবীন্দ্রনাথ

(৬) "বার্ধক্য কিছু অর্জন কর্‌তে পারে না বলে' কিছু বর্জন কর্‌তে পারে না। বার্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না বলে' কিছু ছাড়তেও পারে না ;"

—প্রমথ চৌধুরী

(৭) "কিন্তু যে কারণেই হোক, প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহ-মনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার প্রমাণ—প্রাচীন সমাজের একদিকে বিলাসী, অপর দিকে সন্ন্যাসী ; একদিকে পত্তন, অপর দিকে বন ; একদিকে রঙ্গালয়, অপর দিকে হিমালয় ;—এক কথায় এক দিকে কামশাস্ত্র, অপর দিকে মোক্ষ শাস্ত্র।"

—প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর 'আমরা ও তোমরা'—এই সমগ্র প্রবন্ধটিই বিরুদ্ধ বিন্যাসের উদাহরণ। আরম্ভ হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(৮) "আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানব সভ্যতার সূতিকা-গৃহ, তোমাদের দেশ মানব-সভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হইতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।"

(৯) "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" —কৃষ্ণদাস কবিরাজ

এখানে বিরুদ্ধ বিন্যাস দুই ভিন্ন বাক্য-গত।

(১০) "ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ॥
ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেমযূথী রসাল॥" —গোবিন্দ দাস

দুই সখা ও সখী কর্তৃক যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার বর্ণনা।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র-কৃত হরগৌরী বা অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনা বিরুদ্ধ বিন্যাসের অতি চমৎকার উদাহরণ। দুইটি স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে, আধ ফণিফণা ধরি রে॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা।
আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরী রে।"

—ভারতচন্দ্র

উপরের তিনটি উদাহরণ হইতে বুঝা যায়,—প্রাচীন বা মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যেও ইহার সুষ্ঠু প্রয়োগ রহিয়াছে।

বিরোধ-মূল অলঙ্কারের আলোচনা শেষ হইল।

শৃঙ্খলা-মূলক অলঙ্কার

কারণ-মালা

কোন কারণের কার্য যদি কারণ হইয়া পরবর্তী কার্য জন্মায় এবং এইভাবে কারণ-পরম্পরা চলে, তাহা হইলে কারণ-মালা অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

(১) "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।"

(২) "পণ্ডিতের সঙ্গ-হেতু হয় শাস্ত্র-জ্ঞান,
শাস্ত্র-জ্ঞান হতে হয় বিনয়-আধান
বিনয় হইলে হয় লোকে অনুরাগী
লোক-অনুরাগে হয় সর্বফল-ভাগী॥"—(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

(৩) "বিষয়-চিন্তা হইতে বিষয়ে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে জন্মে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সংমোহ, সংমোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধি-নাশ এবং বুদ্ধি-নাশ হইতে বিনাশ ঘটিয়া থাকে।"
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২।৬২-৬৩

একাবলী

পর পর বাক্যের বিশেষ্য যদি ক্রমান্বয়ে পূর্ব পূর্ব বাক্যের বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে একাবলী অলঙ্কার হয়।

একাবলী অর্থ—একের আবলী বা শ্রেণী; এখানে একরূপ ভঙ্গীবিশিষ্ট রচনার শ্রেণী বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহার প্রচলিত অর্থ—'একমাত্র মুক্তাদির শ্রেণী', একযষ্টিকা বা একনর হার। একই শৃঙ্খলা-ক্রমে সন্নিবেশ-হেতু এই অর্থের সহিতও অলঙ্কারটির সাদৃশ্য স্পষ্ট। উদাহরণ—

(১) "মরি এই সরোবর কমল-ভূষিত।
কমলকুসুম সব, ভৃঙ্গ-সুশোভিত॥
ভৃঙ্গগণ ঝঙ্কারিছে, সঙ্গীত-চতুর।
সঙ্গীত হরিছে মন, মূর্ছনা মধুর॥"
—নিবাতকবচ বধ (সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

এখানে চারটি বাক্যের মালা। পরবর্তী বাক্যগুলিতে 'সঙ্গীত', 'ভৃঙ্গ' ও 'কমল',—এই বিশেষ্যগুলি পূর্ব পূর্ব বাক্যে যথাক্রমে 'সঙ্গীত-চতুর', 'ভৃঙ্গ-সুশোভিত', ও 'কমল-ভূষিত',—এই বিশেষণগুলি রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব একাবলী অলঙ্কার।

(২) "সে জল ছিল না, যাহা কমল-বিহীন;
কমল ছিল না, যাহা অলিদল-হীন;
সে অলি ছিল না, যাহা গুঞ্জন না করে;
গুঞ্জন ছিল না, যাহে মন নাহি হরে।"—(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

এখানে নিষেধ-মুখে অলঙ্কারটির প্রকাশ হইয়াছে।

(৩) "তাঁর কাব্য বর্ণনা-বহুল; তাঁর বর্ণনা চিত্র-বহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণ-বহুল।"
—বুদ্ধদেব বসু

(৪) "এসো তুমি অর্ধ-স্পষ্ট অস্পষ্ট অতলে
মাটি যেথা জল হ'য়ে ঝরে,
জল যেথা অগ্নি হ'য়ে জ্বলে,
অগ্নি যেথা বায়ু হ'য়ে শূন্যে মিশে যায়।" —বুদ্ধদেব বসু

'জল হ'য়ে' বা 'অগ্নি হ'য়ে' বিশেষণাত্মক পদসমষ্টি।

পূর্ববর্তী বিশেষ্যপদ পরবর্তী পদার্থের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও একাবলী অলঙ্কার হয়; যথা—

(১) "গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি
সুন্দর ধরাতল।" —যতীন্দ্রমোহন বাগচি

এইরূপে পূর্ববর্তী সমাপিকা ক্রিয়াপদ পরবর্তী বাক্যে অসমাপ্তিসূচক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়া সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিলে একাবলী অলঙ্কার হইয়াছে বলিতে পারা যায়; যথা—

(১) "শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ
ভুলিয়া পিরীতি কৈলুঁ ॥" —জ্ঞানদাস

(২) 'জীবনের আত্মলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে তাকে দেখ্‌তেই পায় না। যদি বা দেখে ত লক্ষ্যই করে না। যদি বা লক্ষ্য করে, তাতে যেন আধ-খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে।" —রবীন্দ্রনাথ

(৩) "এ দিকে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সংবাদ না পাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া শেষে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।" —বঙ্কিমচন্দ্র

সার

বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হইলে সার অলঙ্কার হয়।

এই অলঙ্কারে বস্তুর উৎকর্ষ সাধারণতঃ শেষ সীমা পর্যন্তই বর্ণিত হইয়া থাকে। উদাহরণ—

(১) "সংসার-ভিতর সার যে বস্তু চেতন,
চেতনের মাঝে সার মনুষ্য-জনম,
মনুষ্যের সার সেই বিদ্যা আছে যার,
বিদ্বানের সভামাঝে বিনয়ীই সার।"—(সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে)

সার অর্থ—শ্রেষ্ঠ। উত্তরোত্তর কে শ্রেষ্ঠ এবং কে পরম শ্রেষ্ঠ, তাহা বর্ণিত হইল।

(২) "ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়-সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয়-সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহৎ তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর অন্য কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরা কাষ্ঠা, তিনিই পরমা গতি।" —কঠোপনিষৎ, ১।৩।১০-১১

(৩) "পৃথিবীর মধ্যে আমার বাঙ্গালা, বাঙ্গালার মধ্যে আমার পল্লীখানি, পল্লীর মধ্যে আমার কুটির, কুটিরে আমার মা জননী। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ মানি।"

কাহারও মতে শ্লাঘ্য-গুণের ন্যায় অশ্লাঘ্য-গুণের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হইলেও সার অলঙ্কার হয়; যথা—

"তৃণের চেয়ে লঘু তুলা, তুলার চেয়ে লঘু যাচক।"

ইংরাজী Climax-এর সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও দুইটি কিন্তু এক অলঙ্কার নয়।

আরোহ (Climax)

উদ্দিষ্ট ভাব বা অর্থ বর্ণনা-গুণে ক্রমশঃ অধিকতর গুরুত্ব-সম্পন্ন ও হৃদয়গ্রাহী হইতে থাকিলে আরোহ অলঙ্কার হয়।

ইংরাজী Climax (Gk. *Klimax*—a ladder)-এর অনুকরণে বাঙ্গালা নামকরণ হইল আরোহ। এই অলঙ্কারে চিন্তা বা অর্থের আরোহ—অর্থাৎ গতি-প্রবাহ ও ক্রমোৎকর্ষ সহজেই পরিলক্ষিত হয়। অর্থের ন্যায় ধ্বনিরও আরোহ বা ক্রম-উত্থান সহজেই অনুভব করা যায়। শব্দের ধ্বনি-রূপ তাহার অর্থের অনুরূপ হইতে থাকে। স্বল্প-ধ্বনি ছোট শব্দগুলি বসে আগে, ধ্বনি-বহুল গাল-ভরা শব্দগুলি বসে পরে। অবশ্য আরোহের শ্রেষ্ঠ উদাহরণেই এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। আরোহ এক বাক্য-গতও হয়, অনেক বাক্য-গতও হয়। উদাহরণ—

(২) "ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর! ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ!"

—স্বামী বিবেকানন্দ

(২) "আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব!"

—বঙ্কিমচন্দ্র

(৩) "এমন রত্ন-খচিত ধবল প্রস্তর নির্মিত কক্ষরাজি কোথাও নাই—এমন নন্দনকানন-নন্দিনী উদ্যান-মালা আর কোথাও নাই ; এমন উর্বশী-মেনকা-রম্ভার গর্ব-খর্ব-কারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র

শেষ বাক্যের অর্থ ও ধ্বনির আরোহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(৪) "হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। দেহক সরবস গেহক সার॥
পাথিক পাথ মীনক পানি। জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥"
—বিদ্যাপতি

ন্যায়-মূল অলঙ্কার

অর্থান্তর-ন্যাস

বিশেষ অর্থ-যুক্ত বাক্য দ্বারা সামান্য অর্থ-যুক্ত বাক্য অথবা সামান্য অর্থ-যুক্ত বাক্য দ্বারা বিশেষ অর্থ-যুক্ত বাক্য সমর্থিত হইলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। এইরূপ কার্য দ্বারা কারণ, অথবা কারণ দ্বারা কার্য সমর্থিত হইলেও অর্থান্তর-ন্যাস অলঙ্কার হয়।

অর্থান্তর অর্থ—অন্য অর্থ বা বিষয়, ন্যাস অর্থ—নিক্ষেপ। যে অলঙ্কারে সমর্থন-কল্পে অন্য বিষয় নিক্ষিপ্ত বা আক্ষিপ্ত হয়, তাহাই অর্থান্তর-ন্যাস।

প্রথম প্রকার অর্থান্তর-ন্যাস

উদাহরণ—

(১) "চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

এখানে প্রথম বাক্য সামান্য অর্থ-যুক্ত বাক্য বা general statement। বাক্যটির অর্থ—কোন চিরসুখীই কোন ব্যথিতের বেদন বুঝে না। ইহা

সমর্থিত হইয়াছে পরবর্তী বিশেষ অর্থ-যুক্ত বাক্য বা particular statement দ্বারা। সে বাক্যের অর্থ—সর্পে যাহাকে দংশন করে নাই, সে বিষের জ্বালা বুঝিতে পারে না। অতএব বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন হওয়ায় এখানে অর্থান্তর-ন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে।

বিশেষ দ্বারা বিশেষের সমর্থন হইলে তাহা প্রতিবস্তূপমা বা দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইতে পারিত।

(২) "অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধন করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপ-পয়, প্রায় তৃষা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবারে?"
—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩) "সবই যায়, কিছুই থাকে না; থাকে শুধু কীর্তি। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে।" —চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

(৪) "সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়—একথা অগ্রাহ্য। উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দন কাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না?" —কাদম্বরী

এখানেও দুইটি বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন। অতএব মালা-অর্থান্তর-ন্যাস।

(৫) "দুঃসহ এ কাজ—তাই তো তোমার 'পরে
দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত।" —রবীন্দ্রনাথ

সুমিত্রার প্রতি কুমারসেনের উক্তি।

এখানে সামান্য অর্থ-যুক্ত বাক্য বা general statement দ্বারা বিশেষ অর্থ-যুক্ত বাক্য বা particular statement-এর সমর্থন হইয়াছে।

(৬) "একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥" —ভারতচন্দ্র

সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থান্তরন্যাস

উদাহরণ—

(১) "সহসা কোন কার্য করিবে না, কেন না অবিবেচনা পরম বিপদের কারণ হয়। লক্ষ্মী গুণ-লুব্ধা হইয়া নিজেই বিমৃশ্যকারীকে বরণ করিয়া থাকেন।" —কিরাতার্জুনীয়ম্

প্রথমাংশে কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে 'লক্ষ্মী গুণ-লুব্ধা হইয়া বিমৃশ্যকারীকে বরণ করিয়া থাকেন।—এইটি হইতেছে বিমৃশ্যকারিত্ব-রূপ কারণের কার্য বা ফল। এখানে তাই কার্য দ্বারা কারণের সমর্থন-রূপ অর্থান্তর-ন্যাস অলঙ্কার।

(২) কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ।
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ॥

কাব্য-লিঙ্গ

কোন পদের অর্থ বা কোন বাক্যের অর্থ বর্ণনীয় বিষয়ের হেতুরূপে প্রতীয়মান হইলে কাব্য-লিঙ্গ অলঙ্কার হয়।

পদের অর্থ বলিতে সমাস-বদ্ধ পদের অর্থও বুঝিতে হইবে। হেতুত্ব ব্যঞ্জনা-শক্তি দ্বারা দ্যোতিত বা প্রতীয়মান হইবে, তাহা সাক্ষাৎভাবে কথিত হইলে চমৎকারিত্ব থাকে না বলিয়া অলঙ্কার হয় না। লিঙ্গ শব্দের এক বিশেষ অর্থ—'অর্থপ্রকাশন-সামর্থ্য'। লিঙ্গ শব্দের মূল অর্থ জ্ঞান-সাধন চিহ্ন বা লক্ষণ ধরিলেও এখানে 'কাব্য-লিঙ্গ' শব্দটির অর্থ-সঙ্গতি হয়।

উদাহরণ—

(১) "কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?" —মধুসূদন

এখানে ব্যঞ্জনা-বলে 'পাবক-শিখা-রূপিণী' এই বিশেষণ পদার্থ মূল বর্ণনীয় বিষয়ের হেতু-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। পাবক শব্দের প্রয়োগে রূপের

ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা দাহিকাশক্তিই অধিক লক্ষ্য করা হইতেছে। এই পাবক-শিখার জন্যই 'হৈম গৃহ'—সোনার লঙ্কা ছারেখারে যাইতেছে;—ইহাই কবির মূল বক্তব্য।

গূঢ়ার্থ-মূলে অলঙ্কার

অপ্রস্তুত-প্রশংসা

অ-প্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণনা হইতে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতীতি হইলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার হয়।

অ-প্রস্তুত অর্থ—অ-প্রস্তাবিত, বর্ণনীয়ের সাধর্ম্য-সূত্রে আক্ষিপ্ত চাঁদ প্রভৃতি। প্রশংসা অর্থ ঠিক স্তুতি নয়, বর্ণনা। কাজেই অলঙ্কারটি সার্থকনামা।

এই প্রতীতি বা বোধ হইয়া থাকে ব্যঞ্জনা-বলে। অ-প্রস্তাবিত হইতে প্রস্তাবিতের বোধ পাঁচ প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে; যথা—(১) অপ্রস্তুত সামান্য বা সাধারণ পদার্থ হইতে প্রস্তুত বিশেষ পদার্থের, (২) অপ্রস্তুত বিশেষ পদার্থ হইতে প্রস্তুত সামান্য পদার্থের, (৩) অপ্রস্তুত কার্য হইতে প্রস্তুত কারণের, (৪) অপ্রস্তুত কারণ হইতে প্রস্তুত কার্যের এবং (৫) অপ্রস্তুত সমান পদার্থ হইতে প্রস্তুত সমান পদার্থের।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে,—সমাসোক্তি অলঙ্কারে প্রস্তুত হইতে অপ্রস্তুতের প্রতীতি হয়, অপ্রস্তুত-প্রশংসায় হয় অপ্রস্তুত হইতে প্রস্তুতের। কারণ, সমাসোক্তিতে প্রস্তুতের উপরে অপ্রস্তুতের ব্যবহার-অরোপ-হয়, আর অপ্রস্তুত প্রশংসায় হয় অপ্রস্তুতের উপরে প্রস্তুতের ব্যবহার-আরোপ।

(১) "পায়ের তলায় ধূলা—সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে।"

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

এখানে 'ধূলা' প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয় নয়, উহা অপ্রস্তুত। কিন্তু প্রশংসা বা বর্ণনা করিয়া বুঝান হইতেছে প্রস্তুত বিষয়কে—'মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান?' অলঙ্কার অপ্রস্তুত-প্রশংসা। এখানে বিশেষ অপ্রস্তুত হইতে সামান্য প্রস্তুতের উপলব্ধি হইতেছে।

(২) "কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে।
কোকিল অখিল-প্রিয় সুমধুর গানে॥ —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কবিতাটি এই পর্যন্ত থাকিলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা। কাক, কোকিল প্রস্তাবিত বিষয় নয়, প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে—গুণহীন ও গুণী জন। এই অর্থে বিশেষ অপ্রস্তুত হইতে সামান্য প্রস্তুতের উপলব্ধি হইতেছে।

কিন্তু কবিতাটিতে ঐ চারি চরণের পরেই আছে,—

"গুণময় হইলেই মান সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই॥"

ছয়টি চরণ একসঙ্গে ধরিলে অলঙ্কার হইবে অর্থান্তর-ন্যাস, কারণ, বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন হইতেছে। অপ্রস্তুত-প্রশংসা গূঢ়ার্থ-মূল অলঙ্কার, প্রস্তুত বা প্রাসঙ্গিক অর্থটি সর্বদাই গূঢ় বা গোপন থাকিবে। এই গূঢ়ার্থের প্রতীতি হইবে ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা। এই অলঙ্কারে তাই সর্বদা ব্যঞ্জনাশক্তির প্রয়োগ চাই।

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কাব্যে বিশেষ হইতে সামান্যের উপলব্ধি-রূপ অপ্রস্তুত-প্রশংসার সুন্দর উদাহরণ মিলিবে। পর পর তিনটি উদাহরণ লওয়া হইল।

(৩) "॥ উদার-চরিতানাম্ ॥
প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম-গোত্র-হীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি' বলে তারে ভালো আছ ভাই॥"
—রবীন্দ্রনাথ

(৪) "॥ কর্তব্য-গ্রহণ ॥
কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য, করিব তা আমি॥" —রবীন্দ্রনাথ

(৫) "॥ কুটুম্বিতা ॥

কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি' উঠে, এস মোর দাদা ॥" —রবীন্দ্রনাথ

তিনটি উদাহরণেই ব্যঞ্জনা-বলে লব্ধ গূঢ়ার্থ কি, তাহা কবিতাগুলির নামেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে প্রতিক্ষেত্রেই অপ্রস্তুত ছোট ফুল, সূর্য, মাটির প্রদীপ, কেরোসিন শিখা বা চাঁদের উপরে প্রস্তুত ক্ষুদ্রব্যক্তি, উদারচরিত ব্যক্তি প্রভৃতি চেতন মানবের ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে; অলঙ্কার তাই সমাসোক্তি নহে। ইহা অর্থান্তর-ন্যাস বা দৃষ্টান্ত প্রভৃতিও নহে, কারণ কেবলমাত্র অপ্রস্তুত পক্ষই বর্ণিত হইয়াছে।

(৬) "চাতক যাচিলে জল হইয়া কাতর,
মৌনভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর?" —উদ্ভট

এখানে ব্যঞ্জনা-বলে প্রস্তুত বিষয় বুঝা যাইতেছে যাচক ও দয়ালু ব্যক্তি।

(৭) "ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে।" —মধুসূদন

এখানে ব্যঞ্জনা-বলে অপ্রস্তুত 'চূড়া', 'বজ্রাঘাত' ও 'ভূধরে'র বর্ণনা হইতে প্রস্তুত 'বীরবাহু' 'রামচন্দ্র' ও 'রাবণে'র উপলব্ধি হইতেছে। বিশেষ হইতে বিশেষের উপলব্ধি হওয়ায় এখানে অপ্রস্তুত সমান পদার্থ হইতে প্রস্তুত সমান পদার্থের উপলব্ধি হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে **"সাদৃশ্যমাত্র-মূলক অপ্রস্তুত-প্রশংসা"** বলিয়া থাকেন।

(৮) "কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবি-কর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে!" —মধুসূদন

সীতার প্রতি সরমার উক্তি। এখানেও পূর্বের উদাহরণের ন্যায় সাদৃশ্যমাত্র-মূলক অপ্রস্তুত প্রশংসা।

(১০) "ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥
বনমালা হল্য পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া॥
মুরলী হল্য বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া॥
এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া।
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া॥ —শ্রীরঘুনন্দন

এখানে পাঁচটি অপ্রস্তুত-প্রশংসার মালা। রাধিকার মুখের উক্তি। অপ্রস্তুত বিষয় হইতেছে,—ধরণী, নূপুর, বনমালা, মুরলী এবং সখাগণ। তাহাদের পুণ্য-মহিমা কীর্তন হইতে ব্যঙ্গ্য হইতেছে রাধিকার পুণ্যহীনতা—অ-ভাগ্য, যে জন্য বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সুখ রাধা কোন প্রকারেই পাইতেছে না। দ্রষ্টব্য—এখানে অলঙ্কারটি বৈধর্ম্যে উপন্যস্ত হইয়াছে।

ব্যাজস্তুতি

নিন্দা দ্বারা স্তুতি অথবা স্তুতি দ্বারা নিন্দা প্রতীয়মান হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়।

ব্যাজ অর্থ—ছল, কপট। ব্যাজস্তুতি শব্দের দুইরূপে ব্যাখ্যা হয়। (১) ব্যাজে স্তুতি, ইহা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি। ইহা প্রথম প্রকার ব্যাজস্তুতি। (২) ব্যাজরূপা স্তুতি, ইহা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা। ইহা দ্বিতীয় প্রকার ব্যাজস্তুতি। এখানেও ব্যঞ্জনার সাধারণ ক্রিয়া দেখা যায়।

নিন্দাচ্ছলে স্তুতি

উদাহরণ—

(১) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ" প্রভৃতি।

৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কবিতাটি ও তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এখানে ব্যাজস্তুতিটি শ্লেষালঙ্কার আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে।

(২) "সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥"

—ভারতচন্দ্র

এখানে বক্তা দক্ষ কেবলমাত্র নিন্দা-অর্থেই বাক্যগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন। কবির রচনাগুণে আমরা স্তুতি-অর্থটিও উপলব্ধি করিতেছি। কবি অপর অর্থ ইঙ্গিত করিয়া শিবনিন্দার ভাগী হইতেছেন না। একটি অর্থ বাচ্য ও অপরটি গম্য বা প্রতীয়মান হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। পূর্বের উদাহরণে এক হিসাবে দুইটি অর্থই বাচ্য। অন্নপূর্ণা এক অর্থ দ্বারা পাটনীকে ধোঁকা দিয়াছেন, অপর অর্থ দ্বারা নিজের কাছে মিথ্যাভাষণ বা শিবনিন্দা-রূপ অপরাধ হইতে মুক্ত রহিয়াছেন। অবশ্য সেখানেও দ্বিতীয় অর্থ আমাদের কাছে প্রতীয়মান অর্থই বলিতে হইবে এবং সেইজন্যই উহা ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের উদাহরণ।

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা

(৩) "শুনহে কুমার! তোমার আজ
কুলের উচিত হইল কাজ।
তব হে জনম অতি বিপুলে
ভুবন-বিদিত অজের কুলে।
জনক-দুহিতা বিবাহ করি
তাহাতে ভাসালে যশের তরী॥"

—হরিশ্চন্দ্র মিত্র

বিবাহ করিয়া প্রত্যাগত রামচন্দ্রের প্রতি বালকগণের উক্তি। নিন্দাপক্ষে—অজ—ছাগ, জনক-দুহিতা—ভগিনী।

স্তুতিপক্ষে—অজ—রামচন্দ্রের পিতামহ, জনক-দুহিতা—জনক রাজার কন্যা সীতা। ইহা বালকগণের পরিহাসোক্তি মাত্র। ইহাও শ্লেষ-গর্ভ রচনা।

স্মরণ

বর্ণনীয় বিষয়ের সাদৃশ্যের অনুভবের ফলে তৎ-সদৃশ বস্তু, তৎসম্পর্কিত বস্তু, অথবা বিসদৃশ বস্তুর স্মরণ হইয়া বিশিষ্ট সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইলে স্মরণ অলঙ্কার হয়।

এই অলঙ্কারে স্মরণার্থক ক্রিয়ার প্রয়োগ আবশ্যক।

সদৃশ বস্তুর স্মরণ হইলে অলঙ্কারটি উপমায় পরিণত হইতে পারে, তখন তাহাকে স্মরণোপমা বলা যায়। কিন্তু তৎসম্পর্কিত বস্তু বা বিসদৃশ বস্তুর স্মরণ হইলে উপমার ভাব থাকে না, সেখানে কেবলমাত্র ভাবানুষঙ্গের ফলেই চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ—

(১) "সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে ক'রে
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা।" —রবীন্দ্রনাথ

ইহাকে স্মরণোপমা বলা যাইতে পারে। সুমিত্রাকে মনে করায় দেবদত্তের জানকীর কথা মনে হইতেছে।

(২) "মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।'
মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসি মুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরু গুরু বুক।" —ইত্যাদি।
—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম দুই চরণে সদৃশ বস্তুর স্মরণ, ইহাকে স্মরণোপমা বলা যাইতে পারে। পরবর্তী চরণ কয়টিতে তৎ-সম্পর্কিত বস্তুর স্মরণে স্মরণালঙ্কার।

(৩) "চাহিয়া চাঁদের পানে তোরে হয় মনে।"

(৪) "অসুর-নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে ;
রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি' দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজ-দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারতভূমি।"

—নজরুল ইস্‌লাম (চিত্তনামা)

(৫) "কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।" —চণ্ডীদাস

(৬) রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ কাব্যের 'মনে পড়ে' কবিতাটি স্মরণালঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ। স্মৃতি-অবলম্বনে অনুভূতিটি বড়ই সূক্ষ্ম, অনির্বচনীয়। এখানে মুখ্যতঃ ভাবানুষঙ্গ বা association-এর ফলেই চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে ;—

"মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে ভোরে শিউলি বনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা আমার মনে ভাসে?
কবে বুঝি আন্‌ত মা সেই ফুলের সাজি বয়ে,
পূজোর গন্ধ আসে যে তাই মায়ের গন্ধ হয়ে॥" —রবীন্দ্রনাথ

কাব্য-স্মৃতি

কাব্য-বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশ্য-অনুভবের ফলে পাঠক-চিত্তে তৎসদৃশ কাব্যের স্মরণ হইতে থাকিলে কাব্য-স্মৃতি অলঙ্কার হয়।

স্মরণ-অলঙ্কারে কাব্য-বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের অথবা কবির স্মরণ অবলম্বন করিয়া কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়। এখানে কাব্যপাঠকালে পাঠক-চিত্তে তুল্য আস্বাদনের ফলে বিস্মৃত-প্রায় পূর্ব কাব্য-সমূহের রসোদ্বোধ ঘটে এবং কাব্য-স্মৃতি জাগে। ইহা তাই কেবলমাত্র পাঠক-চিত্তের ব্যাপার।

উদাহরণ—

(১) "সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিল বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।" —মধুসূদন

এই অংশ-সম্বন্ধে মধুসূদন স্বয়ং মন্তব্য করিয়াছেন,—

"By the by, these lines will no doubt recall to your mind the lines,—

"And whisper whence they stole
Those balmy spoils'—of Milton and the lines—
'Like the sweet south,
That breathes upon a bank of violets
Stealing and giving odour'—of Shakespeare.

Is not the 'চুম্বন' a more romantic way of getting the thing than stealing ?''

এখানে উৎকর্ষ-সম্পাদন হইয়াছে।

(২) "সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্মতি।" —মধুসূদন

এই কয়টি চরণ পড়িলেই মনে হয় বর্জিলের ইনিড কাব্যে ইনিয়াসের প্রতি ক্ষিপ্তা ডাইডোর উক্তি ; যথা—

"Not sprung from noble blood, not goddess-born,
But hewn from hardened entrails of a rock,
And rough Hyrcanian tigers gave thee suck !"
—Dryden's *Virgil's Æneid*

ইতালীয় কবি ট্যাসোর 'Jerusalem Delivered' কাব্যেরও অনুরূপ স্থল স্মরণ হয়।

(৩) মেঘনাদ-বধ কাব্যের পঞ্চম সর্গে বর্ণিত প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ এবং ইন্দ্রজিতের প্রেম-সম্বোধনের দৃশ্য (৩৬৯ হইতে ৩৮৭ চরণ)।

উহা পড়িলেই তৎক্ষণাৎ কবি মিল্টন-বর্ণিত ইভের নিদ্রাভঙ্গ এবং অ্যাডামের প্রেম-সম্বোধনের দৃশ্যখানি (Paradise Lost, Book V) মনে পড়ে—এবং কাব্যের আস্বাদন গাঢ় হইয়া উঠে। এখানে তাই চমৎকার কাব্য-স্মৃতি।

(৪) কবি হেমচন্দ্র-রচিত বৃত্র-সংহার কাব্যের প্রথম সর্গ।

উহা পাঠকালে অনিবার্য ভাবেই মিল্টনের Paradise Lost কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের অনেকাংশের স্মৃতি জাগে ও নূতন আস্বাদন হয়।

(৫) রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী কবিতা। (চিত্রা)

এই কবিতা-পাঠে প্রথমাংশে বাণভট্টের কাদম্বরী কথাকাব্যের নায়িকা কাদম্বরীর প্রগাঢ় রস-সৌন্দর্য স্মৃতিপথে উদিত হইয়া এক অপূর্ব চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে। এখানে কাব্য-স্মৃতির কারণ কবিতাটির আরম্ভেই ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—

"অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে,..."

ঐ একবার মাত্র উল্লেখ—'অচ্ছোদসরসী'। একটিমাত্র নাম-সঙ্কেতেই ব্যঞ্জনা-ধর্মে কাদম্বরী-কাব্যের অভিনব রস-চর্বণা হইয়াছে।

কবিতাটির শেষাংশে কালিদাসের কুমার-সম্ভব কাব্যে বর্ণিত হিমালয়ের অকালবসন্তের দৃশ্য ও মদনের আক্রমণ-দৃশ্যের কথাই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কালিদাসকে অনুকরণ করেন নাই; বরং পূর্বতন দৃষ্টি অনুসরণ ও অতিক্রম করিয়া নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়ও স্থানে স্থানে কালিদাসের বর্ণনার ছায়া পড়িয়াছে, যেমন—

"ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে,
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ,"

তুলনীয়—কালিদাসের—

"শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকূণ্ডয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥

(৬) রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল কবিতা। (কল্পনা)

এই কবিতা পড়িতে পড়িতে প্রাচীন ভারতের বর্ষাকাব্য-সমূহের বিচিত্র স্ফুরণ হইতে থাকে। কালিদাসের ঋতু-সংহার ও মেঘদূত এবং জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের আস্বাদিত সৌন্দর্য-রাশি প্রতি-স্তবকেই বাসনার স্তর ভেদ করিয়া চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয়।

বিবিধ

তুল্য-যোগিতা

প্রস্তাবিত অথবা অ-প্রস্তাবিত পদার্থ-সমূহ একই গুণ বা ক্রিয়া দ্বারা সম্বন্ধ-যুক্ত হইলে তুল্য-যোগিতা অলঙ্কার হয়।

তুল্য যোগ অর্থাৎ সমান সম্বন্ধই অলঙ্কারটির মূল কথা এবং সেখানেই উহার নামের সার্থকতা। উদাহরণ—

(১) "লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'টানি' এই ক্রিয়া দ্বারা 'হাসি', 'বাণী' ও 'প্রাণ' এই তিনটি প্রস্তাবিত পদার্থ সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছে।

(২) "শুধু র'বে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম, শুধু পিতৃ-স্নেহ,
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'র'বে' এই ক্রিয়া দ্বারা যে পদার্থ-সমূহ সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রসঙ্গ-বলে প্রস্তাবিত বলিয়াই ধরিতে হয়।

দীপক

প্রস্তাবিত ও অ-প্রস্তাবিত এই উভয় পদার্থ একই গুণ বা ক্রিয়া দ্বারা সম্বন্ধ-যুক্ত হইলে, অথবা অনেক ক্রিয়াপদ একই কারক দ্বারা সম্বন্ধ-যুক্ত হইলে দীপক অলঙ্কার হয়।

প্রথম প্রকার দীপক

(১) "ঘটিলে খলের সঙ্গ সকলে শঙ্কিত।
খলে আর বিষধরে ধরে এক রীত।"

এখানে 'খল' প্রস্তাবিত এবং 'বিষধর' অ-প্রস্তাবিত, এই উভয় পদার্থ 'ধরে' ক্রিয়া দ্বারা সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছে।

(২) "শক্তির আধার বটে নদী আর নারী
পিপাসা-বারিণী, জীবন-দায়িনী।" —অমৃতলাল বসু

এখানে 'পিপাসা-বারিণী' ও 'জীবন-দায়িনী' এই গুণ দ্বারা প্রস্তাবিত 'নারী' ও অ-প্রস্তাবিত 'নদী' সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছে।

(৩) "যম আর প্রেম
উভয়েরই সমদৃষ্টি সর্বভূতে।" —রবীন্দ্রনাথ

(৪) "তুষ্ট হইলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়।" —ভারতচন্দ্র

দ্বিতীয় প্রকার দীপক

(১) "বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীরে, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে নয়টি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া 'আমি' এই উহ্য কর্তৃকারক দ্বারা সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছে। ক্রিয়াগুলি পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়ায় তাহাদের অর্থের ক্রম ও উপযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অর্থ-শ্লেষ

স্বভাবতঃ এক-অর্থ-যুক্ত শব্দ দ্বারা প্রসঙ্গ-বলে অনেক অর্থ বাচ্য হইলে অর্থ-শ্লেষ অলঙ্কার হয়।

শব্দগুলি একার্থক হওয়ায় শব্দ-শ্লেষ অলঙ্কার হইতে পারে না। শব্দের অভিধাশক্তির সহিত লক্ষণাশক্তির প্রয়োগেই একার্থক শব্দ প্রসঙ্গানুরোধে বিভিন্ন অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

উদাহরণ—

(১) ৩৭ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যাত 'অতিবড় বৃদ্ধ পতি', 'কপালে আগুন', 'কণ্ঠভরা বিষ' প্রভৃতি উক্তি।

(২) "ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জল দান করেন, ফল দান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।" —রবীন্দ্রনাথ

লক্ষণাশক্তির বলে 'জল দান করেন' হইতে আরম্ভ করিয়া উক্তিগুলির মা ও বর্ষা ঋতুর পক্ষে দুই প্রকার অর্থ লক্ষণীয়।

সহোক্তি

সহার্থক শব্দের বলে এক বস্তু দুই পদার্থে অন্বিত হইয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করিলে সহোক্তি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

(১) "চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।"

—চণ্ডীদাস

এখানে সহশব্দের বলে নিঙাড়ি—এই ক্রিয়াপদ যথাক্রমে 'নিংড়াইয়া' ও 'মোচড়াইয়া' অর্থে নীলশাড়ী ও পরাণ—এই দুই পদার্থে অন্বিত হইয়াছে। রচনার চমৎকারিত্ব স্পষ্ট।

ভাবিক

অতীত বা ভবিষ্যৎ পদার্থ প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইলে ভাবিক অলঙ্কার হয়।

ইহা ইংরাজীর Vision-এর অনুরূপ।

উদাহরণ—

অতীত পদার্থ :

রবীন্দ্রনাথের 'তপোবন' ও 'প্রাচীন ভারত' কবিতা। (চৈতালি)

ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ভবিষ্যৎ পদার্থ

"আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজোমূর্তিমান্
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি' যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা।"—কামিনী রায় (আশার স্বপন)

এখানেও ক্রিয়াপদের বর্তমানের রূপ লক্ষণীয়।

সূক্ষ্ম

সূক্ষ্ম অর্থ মুখে না বলিয়া আকার, ইঙ্গিত, ভঙ্গী বা সঙ্কেত দ্বারা সূচিত করিলে সূক্ষ্ম অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

"প্রেমিকের চোখে মিলনের কাল কখন, এই জিজ্ঞাসা জাগিলে প্রেমিকা হস্ত-স্থিত লীলাপদ্ম নিমীলিত করিলেন।"

এখানে এই ইঙ্গিত বা সঙ্কেত দ্বারা সন্ধ্যাই মিলনের কাল সূচিত হইল। গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই এইরূপ সঙ্কেত করা হইয়া থাকে।

দ্রষ্টব্য—মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে অহির সহিত শিখীর যুদ্ধ এবং যুদ্ধে শিখীর পতন দ্বারা ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধ এবং ইন্দ্রজিতের পতন সূচিত হইলেও উহা প্রকৃত সূক্ষ্ম অলঙ্কার নহে।

উল্লেখ

গ্রহীতার বা বিষয়ের ভেদ-হেতু একই বস্তু নানারূপে উল্লিখিত হইলে উল্লেখ অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

(১) "মল্লদিগের নিকট অশনি, কামিনীগণের নিকট সাক্ষাৎ মদন, বসুদেব-দেবকীর নিকট শিশু, দুষ্ট রাজগণের নিকট শাস্তা, ভোজপতি কংসের নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যু, যোগিগণের নিকট পরম তত্ত্ব……শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত রঙ্গ-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন।" —শ্রীমদ্ভাগবত

এখানে গ্রহীতার ভেদহেতু বিবিধ উল্লেখ।

(২) "কিন্তু শুনিয়াছি
স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ।" —রবীন্দ্রনাথ

এখানে বিষয়ের ভেদ-হেতু দ্বিবিধ উল্লেখ।

সংসৃষ্টি

কোন রচনায় একাধিক অলঙ্কার পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে থাকিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করিলে সংসৃষ্টি অলঙ্কার হয়।

একাধিক শব্দালঙ্কারের সংসৃষ্টি, একাধিক অর্থালঙ্কারের সংসৃষ্টি এবং একাধিক শব্দ ও অর্থ উভয়ালঙ্কারের সংসৃষ্টি হইতে পারে।

উদাহরণ—

"শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জন ;
সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদ, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এহেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।" —মধুসূদন

এখানে ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাস—এই দুইটি শব্দালঙ্কার এবং তুল্যযোগিতা (মেঘের গর্জন, সিংহনাদ, জলধির কল্লোল—এই তিনটি অপ্রস্তুত 'শুনেছি' ক্রিয়াদ্বারা সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছে), আরোহ ও ব্যতিরেক—এই তিনটি অর্থালঙ্কারের সংসৃষ্টি হইয়াছে।

সঙ্কর

কোন রচনায় একাধিক অলঙ্কারের সন্দেহ উপস্থিত হইলে সঙ্কর অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

'নয়ন-পল্লব মনোহর', [৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

এখানে উপমা-রূপকের সঙ্কর হইয়াছে। এইরূপ 'অশ্রু-শিশিরে ধৌত'—এখানেও উপমা-রূপকের সঙ্কর।

সমাপ্ত